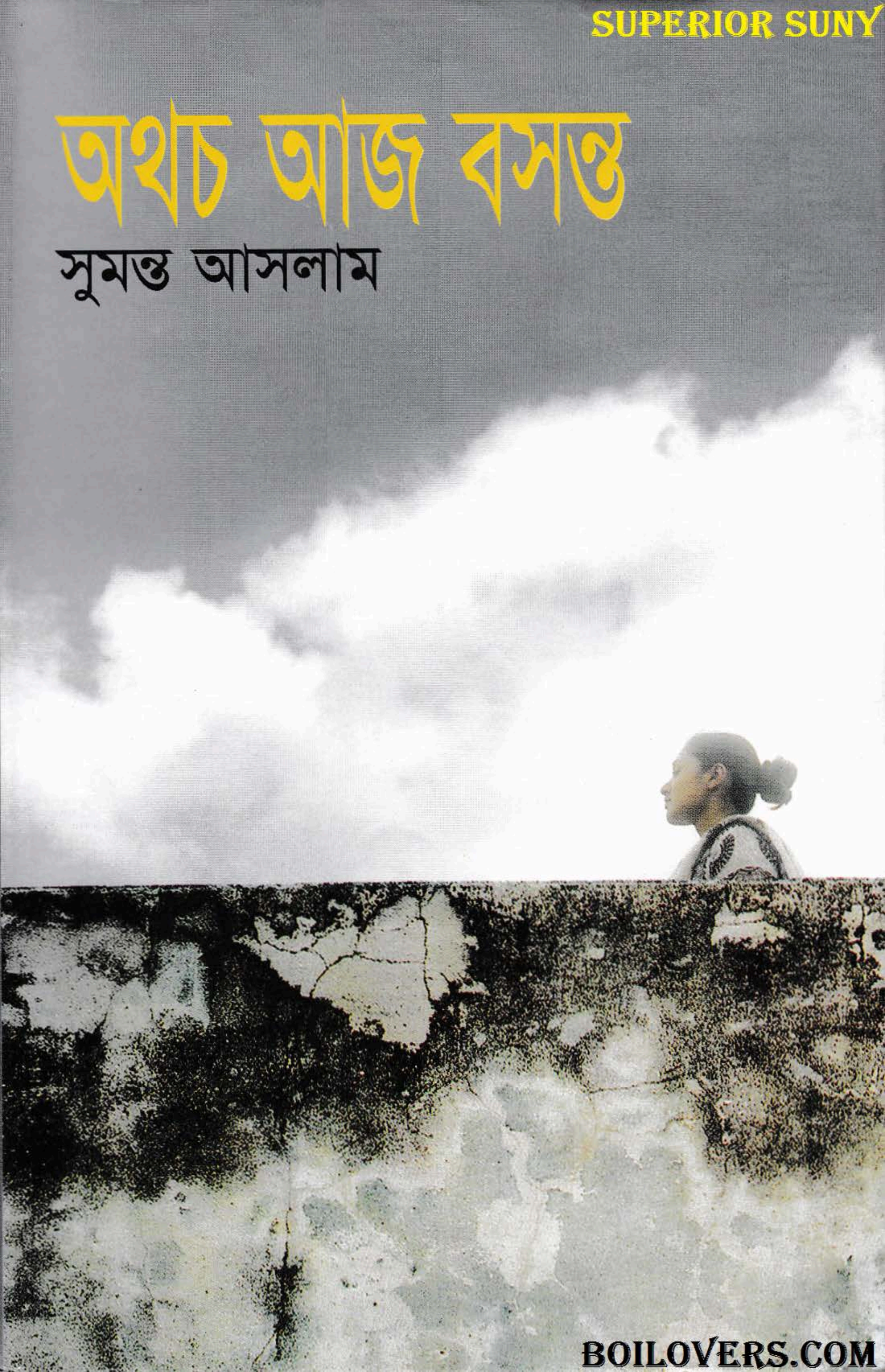
SUPERIOR SUNY
অথচ আজ বসন্ত
সুমন্ত আসলাম
BOILOVERS.COM

ঘুম থেকে ওঠে নূপুর একদিন দেখল, তার বাবা বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছেন। বাবাকে খুঁজতে থাকে নূপুর।

বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে সে অনেক কিছু ভাবে। পল্লব নামে যে ছেলেটি প্রায়ই তার বাসায় আসে, ছেলেটা আসলে কে? সে কি তার কাছে কিছু চায়?

কিছুই বুঝতে পারে না নূপুর।

কিংবা বিদেশী এক দম্পতি, যে তাকে মেয়ে হিসেবে পেতে চায়, তারা কেন মেয়ে হিসেবে পেতে চায় তাকে?

এটাও বুঝতে পারে না নূপুর।

দিন শেষে বাবাকে এক সময় খুঁজে পায় নূপুর। কিন্তু যে জায়গায় খুঁজে পায়, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি, তা সে কখনো কল্পনাও করেনি।

তারপর প্রতিটা বসন্ত কেটে যায় তার, পুরনো পাতা পড়ে নতুন পাতা গজায়, নতুন ফুল ফোটে গাছে। কিন্তু সে আগের মতোই রয়ে যায়—একা একা, চুপচাপ।

সুমন্ত আসলাম

অথচ আজ বসন্ত

কাকলী প্রকাশনী

চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

©
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
কম্পিউটার গ্যালাক্সি
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ৮৫ টাকা

ATHOCHO AAJ BOSHONTOO by Sumonto Aslam
Published by A. K. Nasir Ahmed Salim
Kakali Prokashoni. 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Cover Design : Druba Esh
Price : Tk. 85.00

ISBN 984-437-342-5

স্যার ডন ব্রডম্যান জানতেন কি না জানি না। স্যার গ্যারি সোবার্স, স্যার ভিভ রিচার্ডস, স্যার রিচার্ড হ্যাডলি, ইমরান খান, সুনীল গাভাস্কার, কপিল দেব, ওয়াসিম আকরাম, মার্ক ওয়াহ্ জানেন কি না তাও জানি না। জানেন কি না ব্রায়ান লারা, শচীন টেন্ডুলকার, ইমজামাম-উল হক, সনাৎ জয়াসুরিয়া, জ্যাক ক্যালিস কিংবা রিকি পন্টিং, জানি না তা-ও। তবে আমরা জানি, আমি জানি— কোনো গল্প নয়, কোনো উপন্যাস নয়, কোনো রাজনৈতিক কলামও নয়; কেবল খেলাধুলাবিষয়ক লেখা লিখেই একজন লেখক প্রবল নন্দিত হতে পারেন, হতে পারেন অপরিসীম জনপ্রিয়, হতে পারেন মুগ্ধ করা মানুষ!

প্রিয় উৎপল শুভ্র, প্রিয় শুভ্র দা

আপনি জানেন সে লেখকটি কে? আপনি কি জানেন— কোনো লেখা শুরু করার আগে অন্তত আপনার একটা লেখা পড়ে নিই আমি!

আমি যে মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এ ব্যাপারটা আমি দারুণ উপভোগ করি। মেয়েরা যে পুরুষদের ভালোবাসে তার কারণ পুরুষরা পূর্ণাঙ্গ নয়, তারা কখনো বড় হয় না। আজীবন বালকই থেকে যায়। কোনো মেয়ে যত জলদি ব্যাপারটা বুঝতে পারে ততই সে পুরুষকে ভালোবাসতে পারে।

—ভারতীয় অভিনেত্রী রেখা

দুটো ঘটনা ঘটেছে আজ আমাদের বাসায়। একটি সুখের ঘটনা, আরেকটি দুঃখের। সুখের ঘটনাটি হচ্ছে– বড় ভাইয়া সত্তর বছর বয়সী একটা বনসাই কিনে এনেছে সত্তর হাজার টাকা দিয়ে। আর দুঃখেরটি হচ্ছে– সকাল থেকে আমাদের বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা অবশ্য মাঝে মাঝেই এ রকম করেন। কোনো কারণে মন-খারাপ হলেই কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যান বাসা থেকে। বেশ কিছুক্ষণ একা একা হাঁটাহাঁটি করে শেষে কোনো এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে ওঠেন। সারা দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে আবার ফিরে আসেন বাসায়।

সম্ভবত বাবা আজ অন্য কোথাও গেছেন। কারণ, প্রতিবার বাসা থেকে বের হওয়ার আগে বাবা তার প্রিয় পানের কৌটা, ছোট্ট চামড়ার ব্যাগটা সঙ্গে করে নিয়ে যান। আজ তিনি এ দুটোর একটাও নেননি। এমনকি নেননি তার সব সময়ের সঙ্গী সেগুন কাঠের লাঠিটিও।

মন-খারাপ হলেই বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার এ অভ্যাসটি বাবার আগে ছিল না। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই এ রকম করেন তিনি। মা বেঁচে থাকার সময় বাবা যদি কোনো কারণে রেগে যেতেন, মা তখন অদ্ভুত একটা কাজ করত। রেগে যাওয়া বাবার সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত এবং অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত বাবার চোখের দিকে। কিছুক্ষণ পর বাবার হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেত মা, সম্মোহিতের মতো মায়ের পেছন পেছন ঘরে চলে যেতেন বাবা।

মায়ের কথা ইদানীং বেশ কম মনে পড়ে। মাত্র তিন বছর আগে মারা যাওয়া মাকে অনেক দিন পর আজ মনে পড়ল। মা যদি আজ বেঁচে থাকত, তাহলে হয়তো কাউকে কিছু না-বলে বাইরে যেতেন না বাবা।

সকাল থেকে বাবা বাসায় নেই– অথচ এখন পর্যন্ত এ কথাটা আমাদের বাসার কেউ জানে না। বড় ভাইয়া তার ছেলে অন্তুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আবার ঘুমাচ্ছে, সঙ্গে বড় ভাবিও। ছোট ভাইয়া বউকে নিয়ে সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়েছিল, গতকাল রাতে ফিরে শ্বশুরবাড়িতে উঠেছে, আমাদের বাসায় এখনো আসেনি। আমাদের কাজের মেয়ে শিউলী সেই যে ভোররাতে রান্নাঘরে ঢোকে, আর বের হতে পারে না। সারা দিন সারা দেশে কী ঘটে গেল দূরের কথা, এ

বাড়িতে কী ঘটে, তা-ই সে জানে না।

'আপা।'

শিউলীর ডাকে চমকে উঠলাম। বললাম, 'কী?'

'অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন বাজছে।'

'তুই ধরছিস না কেন?'

'বড় ভাবি আমাকে টেলিফোন ধরতে মানা করেছে।'

'কেন?'

'জানি না।'

বিছানা থেকে উঠে ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি ৯টা বেজে গেছে। টেলিফোনটা বাজছে। আমি নিশ্চিত ফোনটা খালার। দু-এক দিন পরপরই ঠিক এ সময়টাতে ফোন করে খালা আমাদের খোঁজ নেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই এ কাজটি করে আসছেন তিনি।

টেলিফোনটা ধরতেই খালা বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ বাসার সবাই মরে গেছে নাকি, টেলিফোন ধরতে এতক্ষণ লাগে!'

'স্যরি খালা।'

'শিখেছিস তো ওই একটা কথাই– স্যরি। এতক্ষণ ফোন ধরলি না কেন?'

'আমি আমার ঘরে ছিলাম, শুনতে পাইনি।'

'তোর বাবা কই?'

খালাকে কথাটা বলতে ভয় হচ্ছে আমার, কথাটা আগেই বলা উচিত ছিল। যদিও তাকে আমরা সারাক্ষণই ভয় পাই। কারণ আমাদের সবাইকে এই খালাই বড় করেছেন। মা প্রতিবছর আমাদের পৃথিবীতে আনার পর অসুস্থ হয়ে পড়ত; তখন খালা এসে আমাদের দেখাশোনা করতেন। শুনেছি, আমার জন্মের পর মায়ের বুকে নাকি দুধ ছিল না, খালাই তার বুকের দুধ খাইয়েছেন আমাকে।

খালা যে আমাদের পিচ্চিকালেই কেবল দেখাশোনা করেছেন, তা নয়। আমরা কোন স্কুলে ভর্তি হব, কীভাবে চলব– সব শিখিয়েছেন। আমাদের মা এত সরল ছিল যে, এ দুনিয়ার অনেক কিছুই সে বুঝত না। সবাই মাকে বলত অচল, বাবা বলতেন বোকা!

'কিরে, চুপ করে আছিস কেন?' খালা কিছুটা চিৎকার করে ওঠেন।

'খালা–।'

'আবার থামলি কেন?'

'বাবা বাসায় নেই খালা।'

'বাসায় নেই মানে! কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

'জানিস না, এটা কী রকম কথা হলো। এক থাপ্পড় দিয়ে একসঙ্গে দুটো

দাঁত ফেলে দেব। একটা লোক বাসা থেকে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল, এই খবরটা আমাকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলি না!'

'খবরটা আমি তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু?...'

কথাটা শেষ করার আগেই খালা আবার চিৎকার করে ওঠেন, 'কিন্তু কী, তুই কি বাংলাদেশ টেলিভিশন নাকি যে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া খবর দেওয়া যায় না! তা তোর খবর বলার সময় কখন?'

'খালা, তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'রেগে যাব না তো হাসব! একটা বৃদ্ধমানুষ বাসা থেকে হাওয়া হয়ে গেল, আর তোরা সব চুপচাপ বসে আছিস। সবার বাসায় খোঁজ নিয়েছিস?'

'না।'

'নিতে হবেও না, আমিই নিচ্ছি।'

ঠাস করে টেলিফোনটা রেখে দিলেন খালা। অনেকক্ষণ টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। এ মুহূর্তে আমার কী করা উচিত, ভেবে পাচ্ছি না।

চোখ ফেটে কান্না আসছে, কিন্তু কাঁদতে পারছি না। আমার বাবা কোথায় গেছে, এটা আমি জানি না, কাউকে সেটা বলতেও পারছি না।

ছোটনের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। ছোটন আমার ছোট ভাই। ও আমার দু বছরের ছোট ছিল। এত ভালো ছাত্র ছিল ও, স্কুলজীবনে কখনো সেকেন্ড হয়নি। ওর খুব শখ ছিল– বড় হয়ে একজন আর্কিটেক্ট হবে। তারপর এমন সব বাড়ির ডিজাইন করবে, মানুষ খুব অল্প জায়গার মধ্যেই তার প্রয়োজনীয় সবকিছু পেয়ে যাবে। ও সারাক্ষণ ভাবত– দেশে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু থাকার জায়গা বাড়ছে না। মানুষকে অল্প জায়গার মধ্যে সবকিছু পেতে হবে। বুয়েটে একদিন ভর্তিও হলো ছোটন এবং একদিন মারাও গেল রোড অ্যাকসিডেন্টে।

ছোটনটা এত মজার মানুষ ছিল, সারাক্ষণ মজার মজার কথা বলত। বাবা ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, সম্ভবত আমিও ছিলাম। মাঝরাতের দিকে একদিন ও আমার ঘরে এসে বলল, 'আপা, তোর সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে।'

চোখ দুটো এইমাত্র বুজে এসেছিল। আমি বেশ বিরক্ত হয়ে বললাম. 'কাল সকালে শুনব।'

'আপা, আমি পড়তে পারছি না।'

'কেন?'

'কথাটা কাউকে না কাউকে বলা দরকার। কিন্তু কাকে বলব। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে যে এসব কথা শুনবে!'

ছোটন এভাবে কথাটা বলল, ভীষণ মায়া হলো আমার। বিছানা থেকে ধরে বসে বললাম, 'বল।'

'না, এখানে বলা যাবে না, আমার ঘরে চল।'

ছোটন ঘরে গিয়ে ওর বিছানায় পা তুলে বসতেই মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'একটা সমস্যায় পড়েছি আপা।'

পূর্ণ চোখে আমি এবার ওর দিকে তাকালাম। ছোটনের চোখ দুটোতে কিসের যেন একটা লজ্জা এসে ভর করেছে। আমি ওর হাত ধরে আমার পাশে বসালাম। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'সমস্যাটা কি খুব বড়, না ছোট?

'বুঝতে পারছি না।'

'তুই তো সে সমস্যাটা বলতেই আমাকে এ ঘরে নিয়ে এসেছিস, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সমস্যাটা বল।'

'সম্ভবত আমি প্রেমে পড়েছি আপা।'

সমস্ত শরীর ফেটে হাসি আসছিল আমার। কোনো রকমে হাসিটা থামিয়ে ওকে বললাম, 'কী করে বুঝলি তুই প্রেমে পড়েছিস?'

'পড়তে পারছি না, সারাক্ষণ বুকের ভেতর কেমন যেন করে।'

'কার প্রেমে পড়েছিস?'

'শর্মীর।'

'শর্মীটা কে?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ে।'

খুব ভালো করে ছোটনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও কাতর-মুখে কথাগুলো বলছে আমাকে। আমার ছোট ভাই, এত মেধাবী একজন ছাত্র, সব বিষয়ে যার অগাধ জানাশোনা, সে কিনা প্রেমে পড়লে কী করতে হয় তা জানে না!

'তুই কি আমাকে বলতে পারবি, তুই কেন শর্মীর প্রেমে পড়েছিস?'

'না।'

'শর্মী কি জানে তুই ওর প্রেমে পড়েছিস?'

'সম্ভবত জানে।'

'ও কি তোকে কিছু বলেছে?'

'না।'

'তাহলে সমস্যাটা কোথায়?'

'সমস্যা হচ্ছে– আমি এখন কী করব?'

'কিছুই না।'

'ওকে কিছু বলতে হবে না!'

'না।'

ছোটন বেশ হতাশার কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'তাহলে ও জানবে কী করে আমি ওকে পছন্দ করি?'

‘কাউকে পছন্দ হলে তা জানাতে হয় না, বোঝাতে হয়। তোর অভিব্যক্তিই বলে দেবে তাকে ভালোবাসিস।’

কথাটা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল ছোটন। কী যেন ভাবছিল একমনে। হঠাৎ মাথাটা উঁচু করে আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, ‘তোকে একটা কথা বলি আপা?’

‘বল।’

‘কিছু মনে করবি না তো?’

‘যদি করি?’

‘তবুও বলব।’

‘তাহলে বল।’

খুব আগ্রহী হয়ে ছোটন বলল, ‘তুই কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিস?’

কোনো রকম দ্বিধা না করে ছোটনের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম, ‘বেসেছি।’

আমার উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটন বলল, ‘তোকে কি কেউ ভালোবেসেছে?’

এবার হাসতে হাসতে বললাম, ‘না।’

‘কেন?’

আবার হাসি পেল আমার। ছোটন এত অবাক হয়ে ‘কেন’ শব্দটা উচ্চারণ করল যে, আমাকে কেউ ভালোবাসেনি, জগতের সবচেয়ে মহা অন্যায় কাজ হয়েছে এটা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, ‘সত্যি করে বল তো ছোটন, আমার মতো একটা মেয়েকে তুই কি কখনো ভালোবাসতিস?’ আমি আমার বাঁ পায়ের দিকে তাকালাম, ‘যার একটা পায়ের নিচের অংশটায় কোনো আঙুল নেই, লম্বা আকৃতির পায়ের বদলে যার পা’টা গোল?’

মাথাটা নিচু করে ফেলল ছোটন। আমি ওর মাথায় চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললাম, ‘মন খারাপ হয়ে গেল তোর? এমনি বললাম কথাটা।’

‘আপা, আমি স্যরি।’

‘কেন?’ আমি হাসতে হাসতে আবার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, ‘সৃষ্টিকর্তা এত কৃপণ হলো কেন, বল তো? কতটুকুই বা মাটি লাগত? আর সামান্য কিছু মাটি হলেই তো সম্পূর্ণ পা’টা হয়ে যেত। এই গাধা, তোর চোখ টলটল করছে কেন?’

চোখ দুটো মুছতে মুছতে ছোটন বলল, ‘এমনি।’

‘আচ্ছা, তুই কী বল তো, এমনিতেই চোখে পানি আসে তোর?’

‘আপা–।’ গলাটা কাঁপছে ছোটনের। ও সেই কাঁপা কাঁপা গলাতেই বলল, ‘আমার যেদিন অনেক টাকা হবে, সেদিন তোকে আমি বিদেশে নিয়ে যাব।’

'কেন?'

'প্লাস্টিক সার্জারি করে তোর পা'টা ঠিক করে ফেলব।'

হাসি হাসি মুখে আমি ছোটনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'আমি যে আমার পা'টা ঠিক করব না ছোটন!'

'কেন?'

'স্রষ্টা যে আনন্দ নিয়ে আমাকে বানিয়েছেন, স্রষ্টার সে আনন্দটা থাক। আমি নাহয় এমনিই থাকি।'

শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ছোটন মাথাটা নিচু করে ফেলতেই আমি আমার ঘরে চলে এলাম। সে রাতে কেন যেন আমার একটুও ঘুম আসেনি। বিছানায় শুয়ে আমি সারা রাত খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখেছি, সে আকাশে নাকি স্রষ্টা বসে থাকেন, বসে বসে আমাদের মঙ্গল করেন। আকাশ দেখতে দেখতে কখনো কখনো আমি স্রষ্টাকেও দেখতে চেয়েছি।

'আপা, টেবিলে নাশতা দেব?'

শিউলীর কথা শুনে আবার চমকে উঠলাম। আজ যদি ছোটন বেঁচে থাকত, তাহলে ওকে নিয়ে আমি সারা শহর ঘুরে বেড়াতাম আর বাবাকে খুঁজতাম। একজন মানুষের দীর্ঘ অনুপস্থিতি মানুষ মনে রাখে না, অথচ সে মানুষটা একদিন কত আপন ছিল, কত আনন্দময় ছিল!

'বড় ভাইয়া ঘুম থেকে উঠেছে?'

'না।'

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলতেই খালা বেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'দুলাভাই তো কারো বাসায়ই যায়নি।'

'সবার বাসায় তুমি ফোন করেছিলে খালা?'

'তোর বাবা এর আগে যাদের বাসায় গিয়েছিল, তাদের তো করেছি, অন্য আত্মীয়দেরও করেছি। কিন্তু কারো বাসায়ই যায়নি দুলাভাই।'

'খালা, তুমি কাঁদছ?'

'কাঁদব না! একটা মানুষ কোথায় গেল, খুঁজে পাচ্ছি না তাকে।'

'খালা, আমি কি একবার বের হব বাসা থেকে?'

'কেন?'

'চারপাশটা একবার খুঁজে দেখি নিই বাবা কোথাও আছেন কি না।'

'সজীব কোথায়?'

'বড় ভাইয়া ঘুমাচ্ছে।'

'ওকে এখনো জানাসনি?'

'না খালা।'

'যা, ওই নবাবটাকে এখন ডেকে তোল।'

‘খালা, আমি কি বাসা থেকে বের হব?’

‘না।’

আবার রাগ করে ফোনটা রেখে দিলেন খালা। আমি আবার শূন্যতায় ডুবতে লাগলাম। চারপাশটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনে হচ্ছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, স্থবির, চুপচাপ।

কলবেলটা বেজে উঠল হঠাৎ। দ্রুত দৌড়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালাম। অন্য দিন হলে আগে জিজ্ঞাসা করতাম– কে? আজ কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দরজাটা খুলেই দেখি একটা ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় বাবার বয়সী মানুষটা। ভালো করে আমি লোকটার দিকে তাকালাম– এ মুহূর্তে কেমন যেন আমার বাবার মতো দেখাচ্ছে মানুষটাকে।

ঘরে ঢুকেই কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে অন্তু বলল, 'ফুপুমণি, বলো তো আমি আজ কার সঙ্গে স্কুল থেকে বাসায় এসেছি?'

'কার সঙ্গে এসেছিস?' অন্তুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি মাত্র সাড়ে ৯টা বাজে। অথচ অন্তুর স্কুল ছুটি হয় ১১টায়। আমি আবার ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কার সঙ্গে এসেছিস?'

ঠোঁট দুটো উল্টিয়ে বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে অন্তু বলল, 'একাই এসেছি।'

'একাই এসেছিস মানে!'

'একাই এসেছি।'

'কেউ তোকে আনতে যায়নি?'

'কে আনতে যাবে, আমার স্কুল তো ছুটি হয় ১১টায়। তখন তো আম্মু আমাকে আনতে যায়। আজ তো ছুটি হয়েছে ৯টায়।'

'তাই একা একা চলে এসেছিস?'

'কী করব? সবাই তো যার যার বাসায় চলে গেল।'

'তাই তুইও চলে এলি, না? তোর খুব সাহস হয়েছে, না?'

'এতে সাহসের কী দেখলে ফুপুমণি। রিকশাওয়ালাকে বললাম, যাবে? রিকশাওয়ালা বলল, যাব। আমি তখন তাকে নিয়ে সোজা বাসায় চলে এলাম। আমি এখন বড় হয়েছি না!'

'তুই বড় হয়ে গেছিস?'

কাঁধ দুটো একটু উঁচু করে বড় মানুষের মতো ভঙ্গি করে ও বলল, 'তোমার কী মনে হয়?'

গভীর চোখে আমি অন্তুর দিকে তাকালাম। অন্তু সত্যি সত্যি বড় হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, একদিন অন্তুর বাবাও কি এভাবে কাউকে না-বলে বাসা থেকে বের হয়ে যাবে? আর অন্তু তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে এভাবে? প্রকৃতি কি এভাবেই প্রতিটি জীবন সাজিয়ে রাখে?

'ফুপুমণি, তোমার চোখে পানি কেন?'

'এমনি। আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হলো কেন, বল তো?'

'আমাদের স্কুলের বুড়ো দারোয়ানটা ছিল না, সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে!'

'হ্যাঁ, কাল রাতে নাকি মারা গেছে। অন্তু কী একটা ভেবে বলল, 'আচ্ছা ফুপুমণি, বুড়ো হলেই কি মানুষ মারা যায়?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আমাদের দাদুও মারা যাবে, তাই না ফুপুমণি?'

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। কোথায় যেন পড়েছিলাম– মৃত্যু; ছোট্ট একটি শব্দ, অথচ কী অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। এক নিমিষে থমকে দাঁড়ায় জীবন, হোক সে তুচ্ছ কিংবা অমিত সম্ভাবনাময়। এক মুহূর্ত আগেও যে ছিল উচ্ছল প্রাণবন্ত, পরমুহূর্তেই সে নেই। কী অবিশ্বাস্য, তাই না!

ব্যাগটা তুলে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে অন্তু। ওকে আমার বলা হয় না– না রে অন্তু, মানুষ কেবল বুড়ো হলেই মারা যায় না, বুড়ো হওয়ার আগেও মারা যায়। যেমন তোর ছোটন কাকু গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর অন্তু দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'ফুপুমণি, দাদু কই?'

কী বলব আমি। মুখটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাতেই অন্তুও সেদিকে এসে বলল, 'বললে না, দাদু কোথায় গেছে?'

অন্তুর মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে আমি বললাম, 'আছে হয়তো কোথাও।'

'কোথায় আছে?'

'বাইরে গেছে।'

'কেন, স্কুল থেকে আসার পর আমার সঙ্গে তো দাদুর খেলার কথা। আচ্ছা ফুপুমণি, দাদু এমন কেন, বলো তো? মাঝে মাঝেই কোথায় যেন চুপি চুপি পালিয়ে যায়।'

আমি কিছু বলি না। আমিই কি জানি– কেন বাবা পালিয়ে যান মাঝে মাঝে। হয়তো জানি, কিংবা জানি না।

মা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর বাবা একদিন খুব সকালে আমার ঘরে এসে বললেন, 'তোকে একটা প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক উত্তর দে তো।'

বিছানা থেকে উঠে বসে বাবার হাতটা ধরে পাশে বসিয়ে বললাম, 'মানুষ কি সব সময় প্রতিটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে?'

'পারে, যদি প্রশ্নের উত্তরটা তার জানা থাকে।'

'সব প্রশ্নের উত্তর মানুষের জানা থাকে না বাবা।'

বিছানার ওপর পা উঠিয়ে বসে বাবা মাথাটা নিচু করে ফেলেন। তারপর কী যেন ভাবেন অনেকক্ষণ। বাবার গায়ের কুঁচকে যাওয়া পাঞ্জাবি টেনে টেনে সোজা করার চেষ্টা করি আমি। সেগুলো সোজা হয় না, তবুও চেষ্টা করি আমি। বেশ কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাবা বলেন, 'একজন বাবা হিসেবে

একশর মধ্যে তুই আমাকে কত দিবি, বল তো?'

'পঞ্চাশ।'

বাবা ম্লান হেসে বলেন, 'একেবারে অর্ধেক কেন রে মা?'

'কারণ, একজন বাবা হিসেবে তুমি শুধু ভালোবাসতেই শিখেছ, কিন্তু শাসন করতে শেখনি কখনো। অথচ বাবা হিসেবে একটা মানুষের দুটো জিনিসই পুরোপুরি দরকার।'

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বাবা বলেন, 'হয়তো।'

'হয়তো না বাবা, একজন বাবার পুরোপুরি দুটো জিনিসই সমান থাকা দরকার।'

বিছানা থেকে নেমে বাবা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে যান। আমি অপলক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকি। ন্যুব্জ হয়ে যাওয়া শরীরটা নিয়ে বাবা এগিয়ে যাচ্ছেন, অথচ ক্রমে ক্রমে বেঁচে যাওয়া এই বাবা একদিন কত শক্ত-সমর্থ ছিলেন। চোখে পানি এসে যায় আমার। টলটল করা চোখে আমি বাবার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি– বাবা হিসেবে তুমি একশতে একশ বাবা। কারণ, মানুষকে ভালোবাসার অসীম ক্ষমতা অনেক মানুষের থাকে না, তোমার আছে।

কলবেলটা বেজে উঠতেই দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল শিউলী। একটু পর শব্দ করে আমার ঘরে ঢুকে খালা বলল, 'এই, ঝটপট রেডি হয়ে নে তো।'

কিছুটা ভয় ভয় গলায় আমি বললাম, 'রেডি হয়ে কী হবে খালা?'

'বাইরে যাব। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিতে হবে আগে।'

কথাটা বলেই টেলিফোনের কাছে চলে গেল খালা। একটু পর দেখি, খালা কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন আর শব্দ করে কাঁদছেন। খালার কান্না দেখে শিউলী থমকে দাঁড়িয়েছে সামনে, অন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে খালার দিকে।

আমি খালার কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখলাম। খালা কাঁদছেনই। বাবার কথা বলতে বলতে খালা থেমে যান, শব্দ করে কাঁদেন। আবার কথা বলেন, আবার কাঁদেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর টেলিফোনটা রেখে খালা আমার দিকে তাকান। চোখ দুটো মুছতে মুছতে ভাইয়ার ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সজীব ওঠেনি এখনো?'

'না।'

'ওকে ডেকেছিলি?'

'না।'

'ভালো করেছিস।' খালা চোখ দুটো মুছতে মুছতে বললেন, 'চল।'

বাসার বাইরে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন খালা। আমি বললাম, 'কিছু

বলবে খালা?'
'আচ্ছা, তোর বাবার পাসপোর্ট সাইজের কোনো ছবি আছে?'
'হ্যাঁ, আছে।'
'একটা ছবি নিয়ে আয় তো।'
'ছবি দিয়ে কী হবে খালা?'
'হাসপাতালে দুলাভাইকে খুঁজে পাওয়া না গেলে পেপারে ছবি ছাপিয়ে ভালো করে একটা বিজ্ঞপ্তি দেব।'
'খালা, এ কাজটা আমরা পরে করি। আগে খুঁজে দেখি, শেষে কোনো কিছু না হলে তখন পেপারে ছবি দেওয়ার কথা ভাবা যাবে।'
'পুলিশকেও জানাতে হবে।'
'আগে হাসপাতালগুলোতে খুঁজে দেখি।'
'চল।'
'গাড়ি নিয়ে আসোনি খালা?'
'না। সকালে তোর খালু গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন গেছে।'
'তাহলে এতগুলো হাসপাতালে খোঁজ নেবে কীভাবে?'
'ক্যাবে করে।'
'তাহলে তো অনেক টাকা লাগবে!'
চোখ দুটো বড় বড় করে খালা আমার দিকে তাকালেন। তারপর একটু এগিয়ে এসে খুব রাগী গলায় বললেন, 'এক থাপ্পড় দিয়ে একসঙ্গে দুটো দাঁত ফেলে দেব। সবাই এখন টাকা চিনিস, না? এ মুহূর্তে তোর বাবা বড়, না টাকা বড়?'
'না, আসলে... আমি তেমন টাকা নিয়ে আসিনি তো!'
'তাতে কি, চল।'
দুটো সরকারি এবং তিনটে হাসপাতাল খুঁজে দেখতেই পুরো দেড় ঘণ্টা চলে গেল আমাদের। বাবাকে পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে এক সরকারি হাসপাতালে খালার প্রায় বমি হওয়ার জোগাড়। এত দুর্গন্ধ সরকারি হাসপাতালগুলোতে। খালার ওরকম অবস্থা দেখে একজন অল্পবয়সী ডাক্তার এগিয়ে আসতেই খালা বেশ রেগে গিয়ে বললেন, 'এটা কি হাসপাতাল, না আবর্জনা ফেলার জায়গা?'
ডাক্তার ফ্যালফ্যাল করে তাকাতেই খালা আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি?'
খুব নিস্পৃহভাবে ডাক্তার বললেন, 'না।'
খালাও খুব নিস্পৃহভাবে বললেন, 'না বোঝারই কথা। যে যেখানে থাকতে অভ্যস্ত আর-কি।' খালা আর কোনো কথা না বলে সোজা বের হয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে।

সারা রাস্তা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাসায় ফিরছিলেন খালা। কিন্তু বাসার কাছাকাছি একটা মোড়ের কাছে থামাতে বললেন ক্যাবটা। তারপর ইশারা করে একজন পুলিশ সার্জেন্টকে কাছে ডেকে বললেন, 'শোনো ছেলে, তোমার মতো আমার তিন-তিনটে ছেলে আছে, ওরা বিদেশে থাকে। তোমাকে তাই তুমি করেই বললাম।'

কিছুটা হকচকিয়ে পুলিশ সার্জেন্ট বললেন, 'জি বলুন।'

'তোমাদের কাজটা কী, বলো তো?'

'কী বলব আপনাকে, আমাদের তো অনেক কাজ।'

'কী কাজ তোমাদের, সারাক্ষণ তো তোমাদের ওই মোটরসাইকেলের ওপর বসে থাকতে দেখি।'

'ওই বসে থাকাটাও একটা কাজ।'

'বসে বসে তোমরা কী কর?'

'সবকিছু দেখি।'

'দেখো?' খালা একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'একটা বুড়োমানুষকে দেখেছ?'

'বুড়োমানুষ!' কিছুটা অবাক হয়ে যান পুলিশ সার্জেন্ট।

'হ্যাঁ, বুড়োমানুষ। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।'

'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তো কত মানুষই হাঁটে।'

'আমি জানি।' খালা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'ওরকম মোটরসাইকেলের ওপর পা তুলে তো কত মানুষই বসে থাকে। তবুও তোমাকে ডাকলাম কেন। আমার এক আত্মীয়কে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যে মানুষটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, তোমার চোখে কি এ রকম কোনো লোক পড়েছে?'

'না।'

'তা পড়বে কেন, তোমাদের চোখে পড়ে কেবল মালবোঝাই ট্রাক আর লক্কড়-ঝক্কড় বাস।'

খালা হনহন করে রাস্তার ওপাশে রাখা ক্যাবের কাছে হেঁটে গেলেন, পেছন পেছন আমিও। কিন্তু ক্যাবে উঠতে গিয়েই খালা আবার ফিরে এলেন ট্রাফিক সার্জেন্টের কাছে, 'কিছু মনে কোরো না বাবা, একটা মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা। কয়েকটা হাসপাতাল ঘুরলাম, পেলাম না। মাথাটা ঠিক নাই বাবা, তুমি কিছু মনে কোরো না।'

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন পুলিশ সার্জেন্ট, 'আমি কিছু মনে করিনি। কারণ আমি জানি মায়েরা ভালোবাসেন, আবার মাঝে মাঝে এভাবে কথাও বলেন।'

বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাইয়া বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

আমি কিছু বলার আগেই আমাকে হাত ইশারা করে থামিয়ে দিলেন খালা। তারপর ভাইয়ার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তোর সঙ্গে আধাঘণ্টা পর কথা বলব। তার আগে কোনো রকম প্রশ্ন করবি না তুই।'

কথাটা শেষ করেই সোজা বাথরুমে ঢুকে গেলেন খালা। দশ মিনিট পর হাতমুখ ধুয়ে বের হয়ে শিউলীকে ডাকতেই দৌড়ে এসে খালার সামনে দাঁড়াল শিউলী। সঙ্গে সঙ্গে কপালটা কুঁচকে ফেললেন খালা। চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'এটা কী?'

কিছুটা বিব্রত হয়ে শিউলী বলল, 'কোনটা, খালা?'

শিউলীর ওড়নার দিকে ইশারা করলেন খালা, 'এটা।'

'এটা তো ওড়না।'

'আমি জানি।' খালা গলাটা আরো গম্ভীর করে ফেলল, 'আমি জানি এটা ওড়না, তিন-চার হাত লম্বা একটা কাপড়। কিন্তু এটা এখানে কেন?'

আরো বিব্রত হয়ে গেল শিউলী। ওড়নাটা গলার সঙ্গে আরো ভালোভাবে পেঁচাতেই খালা একটু শব্দ করে বললেন, 'ওড়না গলায় পেঁচানোর জিনিস না, গায়ে জড়ানোর জিনিস। যাও, একটা জায়নামাজ নিয়ে এসো।'

গলা থেকে ওড়নাটা নামিয়ে শিউলী বলল, 'স্যরি খালা।' তারপর পাশের ঘর থেকে জায়নামাজ আনার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু দু পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। খালা পেছন থেকে ডাক দিলেন, 'এই মেয়ে!'

ঘুরে দাঁড়াল শিউলী, 'জি খালা।'

অবাক করা চোখে শিউলীর দিকে ঝুঁকে এসে খালা বললেন, 'কী বললে?'

'স্যরি বলেছি খালা।'

'তুমিও স্যরি বলা শিখেছ!'

বেশ লজ্জা পেল শিউলী, 'আপা সব সময় বলে তো, আপার কাছ থেকে শিখেছি।'

খালা একটু এগিয়ে এসে আমার বিছানার পাশে বসলেন। আমি বালিশ

থেকে মুখ তুলে বললাম, 'জায়নামাজ দিয়ে কী হবে খালা?'

'নামাজ পড়ব।'

'এখন কিসের নামাজ?'

'বারো রাকাত নফল নামাজ পড়ব। মানুষের যখন বিপদ হয় তখন বেশি বেশি আল্লাহকে ডাকতে হয়।'

হাসতে হাসতে খালার একটা হাত ধরে বললাম, 'যখন বিপদ থাকে না, তখন ডাকতে হয় না?'

'তখনো ডাকতে হয়। শোন, হাদিস শরিফে কী লেখা আছে, জানিস- ?'

খালাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'জানি। তুমি এ কথাটা এর আগেও কয়েকবার বলেছ আমাকে।'

শিউলী জায়নামাজ নিয়ে এসেছে। খালা সেটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন আমার পাশে। আমি খালার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'কী ভাবছ খালা?'

'তোর মায়ের কথা ভাবছি।'

কী অদ্ভুত! মায়ের কথা আমিও ভাবছিলাম। ছোট ভাইয়ার একবার ভীষণ জ্বর হলো। কোনো কিছুতেই কিছু হয় না। এ-ডাক্তার সে-ডাক্তার, জ্বর তবু কমে না। শেষে মা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে জায়নামাজে বসেছিল। ভাইয়ার জন্য সেবার কয়েক শ রাকাত নফল নামাজ পড়েছিল মা। ভাইয়া সুস্থ হওয়ার কিছুক্ষণ পর মাকে বলেছিলাম, 'একজন মা আর একজন সন্তানের মধ্যে মূলত পার্থক্য কী, বলো তো?'

মা কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'পার্থক্য আবার কী, মা সব সময়ই মা, ছেলেমেয়ে সব সময় ছেলেমেয়ে।'

'কিন্তু এ মুহূর্তে পার্থক্যটা কী, জানো– তুমি তোমার সন্তানের রোগমুক্তির জন্য অনেক পরিশ্রম করেছ, কিন্তু তোমার রোগমুক্তির জন্য তোমার সন্তানরা তার এক ভাগও পরিশ্রম করবে না।'

'আমি জানি।'

'তুমি জানো?'

'প্রতিটি মা-ই জানে। তবু তারা সন্তানের জন্য সবকিছু করে।'

'কেন?'

'যখন মা হবি, তখন উত্তরটা খুঁজে দেখিস।'

কোনো কিছুতেই আমি সহজে অবাক হই না, সেদিন হয়েছিলাম। আমি একদিন মা হব! আমি মা হব? সারা দিন সেদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে হেসেছিলাম আমি। দেশের যেখানে ভূরি ভূরি স্বাভাবিক সুন্দর মেয়ে বিয়ে-জটিলতায় ভোগে, সেখানে আমার মতো একজন খোঁড়া মেয়েকে কেউ বিয়ে

করবে? তারপর আমি আবার মা হব!

কিছুটা বড় হওয়ার পর দাদু প্রায়ই বলতেন, ঘরে প্রজাপতি এলে নাকি সে বাড়িতে বিয়ে হয়। অবিশ্বাস্য কথা। তার পরও কথাটা শোনার পর আমি আমার ঘরে প্রতিদিন প্রজাপতি খুঁজেছি এবং এ পর্যন্ত পঞ্চাশটির মতো পেয়েছিও, সবশেষে সেই একাই রয়েছি।

নামাজ শেষ করে খালা আবার আমার বিছানায় এসে বসলেন। কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে বললেন, 'টেলিফোনটা এ ঘরে নিয়ে আসা যাবে?'

'যাবে।'

'নিয়ে আয়।'

টেলিফোনটা এনে খালাকে দিতেই খালা সেটা কোলের ওপর নিয়ে ডায়াল করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ওপাশে রিং হতেই খালা বললেন, 'তেজগাঁও থানা?' রিসিভারটা কানের সঙ্গে ঠেস দিয়ে ধরে খালা কপাল কুঁচকালেন, 'কিছু শোনা যায় না তো!'

'সেটটাতে একটু সমস্যা আছে খালা।'

'হ্যালো... হ্যালো..., লাইনটা কেটে গেল।' খালা বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের দেখি সবই সমস্যা। আপা মারা যাওয়ার পর থেকে সংসারটা গেছে। এখন কী করব বল।'

'টেলিফোনের লাউড স্পিকারটা চালু করে দিই, কথা বলতে অসুবিধা হবে না তাহলে।'

লাউড স্পিকারটা চালু করে দিয়ে খালা আবার ডায়াল করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর লাইনটা পেয়েই খালা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'টেলিফোনে এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

লাউড স্পিকার থেকে ভেসে এলো, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আমি তো বাংলা ভাষাতেই কথাটা আপনাকে বলেছি, হিব্রু ভাষায় তো বলিনি! টেলিফোনে এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সারাক্ষণ এনগেজ্ড্।'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি যে-ই বলি না কেন, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'থানার ফোন এ রকম এনগেজ্ড্ থাকেই।'

'কেন?'

'বিজি অফিস, এনগেজ্ড্ থাকবে না!'

'ফোন যদি সারাক্ষণ এনগেজ্ড্ই থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ আপনাদের পাবে কীভাবে?'

'তা আমরা কী জানি!'

'আমরা কী জানি মানে!' খালা কিছুটা চিৎকার করে ওঠেন, 'কী করেন

আপনারা সারাক্ষণ, ঘাস কাটেন?'

'কে বলছেন আপনি?'

'পরিচয় দিলে তো আবার ম্যাডাম ম্যাডাম বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলবেন। আপনাদের ওসি সাহেব আছেন?'

'জি না, উনি বাইরে আছেন।'

'তার নিচের পোস্টের কে আছেন?'

'আপাতত একজন সাব-ইন্সপেক্টর আছেন।'

'ওনাকে দিন।'

'উনি অন্য রুমে আছেন, এখান থেকে ওনার কাছে লাইন ট্রান্সফার করা যায় না।'

রাগে গজগজ করতে করতে খালা বললেন, 'ওনার মোবাইল নম্বরটা দিন।'

'বাইরের কাউকে ওনার মোবাইল নম্বর দেওয়া নিষেধ আছে।'

প্রচণ্ড রাগে লাইনটা কেটে দিলেন খালা। তারপর পাশে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে চিৎকার করে কাকে যেন কী বললেন। আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের বাসায় তিনজন পুলিশ এসে উপস্থিত।

খালাকে দেখেই একজন পুলিশ সালাম দিল। খালা তাদের ইশারা করে বসতে বলেই বললেন, 'খুব বিপদে পড়ে আপনাদের স্মরণ করা হয়েছে।'

'আমরা জানি ম্যাডাম।'

'আপনারা কী জানেন?'

'আপনাদের একটা লোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমাদের একটা লোক মানে কি, আমার দুলাভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'জি ম্যাডাম।'

'এত ম্যাডাম ম্যাডাম করবেন না তো, শুনতে বিশ্রী লাগে!' খালা একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'আজ বিকেলের মধ্যে আমি আমার দুলাভাইকে বাসায় দেখতে চাই।'

'জি ম্যাডাম।'

'আপনারা এখন যেতে পারেন।'

তিনজনের মধ্যে প্রথম পুলিশটি বলল, 'ম্যাডাম, ওনার কি কোনো ছবি আছে?'

খালা কিছু বলার আগেই আমি বাবার একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এনে দিলাম। ছবিটা দেখেই পুলিশটা বলল, 'এ তো বৃদ্ধমানুষ! আপনারা হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'কয়েকটা হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি।' খালা বললেন।

'উনি কি খুব বেশি অসুস্থ?'

'না, তবে তিনি কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন।'

'এর আগেও কি তিনি এ রকম করেছেন?'

'জি। তবে এবারের হারিয়ে যাওয়াটা বোধহয় অন্যরকম।'

পুলিশ তিনজন চলে যেতে নিয়েই প্রথম পুলিশটি ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি ওনার কে হন।'

'মেয়ে।'

'তাহলে তো আপনি এ বাসাতেই থাকেন।'

'জি।'

'আচ্ছা, আপনারা কি কখনো কোনো ফোন-টোন পেয়েছেন, এই যেমন অপহরণ করা হবে, দেখে নেওয়া হবে– এ রকম হুমকিওয়ালা টেলিফোন।'

'না।'

'আপনি শিওর?'

'জি।'

পুলিশ তিনজন চলে যেতেই বড় ভাইয়া বেশ রেগে রেগে বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

খালা খুব শান্ত গলায় বললেন, 'তোরা তো অনেক কিছুই বুঝতে পারিস না সজীব।'

'বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না, বাবা তো একেবারে হারিয়ে যাননি। একটু পরই পাওয়া যাবে তাকে।'

'পাওয়া যেতে পারে।' কথাটা বলে একটু থেমে খালা বললেন, 'আবার নাও পাওয়া যেতে পারে।' খালা একটু এগিয়ে গিয়ে বড় ভাইয়ার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখলেন মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সজীব, অন্তু তো তোর ছেলে, না?'

ভাইয়া কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'একদিন ও অনেক বড় হবে, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আল্লাহ্‌র কাছে এখন থেকে সব সময় চাইব– তোর ছেলে একদিন তোর মতো বড় হোক, আর তুই তোর বাবার মতো বুড়ো হ।'

শব্দ করে কেঁদে উঠলেন খালা। ঝরঝর করে খালার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। সমস্ত বুক চেপে আসছে আমার। একটা বৃদ্ধমানুষকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কাঠের একটা আলমারি আছে আমার। নিজেকে যখন খুব বেশি একা লাগে তখন আলমারিটা খুলি আমি। আমার অনেক ছোটখাটো জিনিসে ভরে আছে সেটা। অপলক চোখে ভেতরটা দেখতে দেখতে আমি একটা ছোট কাঠের বাক্স হাতে নিই। আমার জন্মের আগে বাবা একটা জিনিস এনেছিলেন এই কাঠের বাক্সে, জিনিসটা এখনো এই বাক্সেই আছে।

খুব শখ করে জিনিসটা কিনে এনে বাবা একদিন বেশ রাত করে বাসায় ফিরে মাকে বললেন, 'সজীবের মা, শোনো।'

বাবা সাধারণত এত রাত করে বাসায় ফেরেন না। মা অবাক হয়ে বলল, 'এত রাত পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?'

'বাজারে একটু ঘোরাঘুরি করলাম।'

'কেন?'

'কারণ আছে সজীবের মা, কারণ আছে।' বাবার মুখে রহস্যময় হাসি।

'আমি তো ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। কি-না-কি হলো আপনার।'

'তুমি থাকতে আমার কিছু হয় না সজীবের মা।'

'আপনার হাতে ওটা কী?'

'একটা জিনিস নিয়ে এসেছি আমি।'

মা কিছুটা উদাসীন হয়ে বলল, 'কী?'

বাবা আগের মতোই রহস্যের হাসি হেসে বললেন, 'বলো তো কী?'

'আমি কী করে বলব?'

'চেষ্টা করো।'

'পারব না।'

'ঠিক আছে, আমি একটা সূত্র দিয়ে দিচ্ছি, তুমি বলো।' বাবা কাঠের বাক্সটা মায়ের হাতে দিয়ে বলেন, 'এটা মেয়েরা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করে।'

মা খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'অ, এটা তাহলে গলার চেইন।'

মায়ের কাছ থেকে কাঠের বাক্সটা নিজের হাতে নিয়ে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বাবা বললেন, 'না।'

'তাহলে কানের দুল?'

'না।'

'হাতের চুড়ি?'

'না।'

মা একটু ভেবে বলল, 'অ বুঝেছি, নাকের নোলক।'

'সেটাও না।'

'তাহলে?'

'তুমি বলো।'

'আমি পারছি না, আপনি বলেন।'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'এক জোড়া নূপুর।'

'অ আল্লাহ্, এটা আপনি কার জন্য এনেছেন?'

'আমার মেয়ের জন্য।'

'আচানক কথা, আপনি আপনার মেয়ে পেলেন কোথায়, আপনার তো দুটোই ছেলে।'

মায়ের উঁচু পেটের ওপর পরম মমতায় হাত রেখে বাবা বলেছিলেন, 'আমার মেয়ে এখানে।'

'যান!' মা কিছুটা লজ্জা পায়, 'আপনি জানেন, আপনার এবার মেয়ে হবে?'

বাবা খুব দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি জানি। আমার মেয়েকে প্রথম কোলে নিয়ে আমি নূপুর দুটো পরিয়ে দেব। ও হাঁটতে পারবে না, কিন্তু একটু নড়ে উঠলেই টুং টুং করে শব্দ হবে। কী অদ্ভুত, না?' বলতে বলতে আনন্দে বাবার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

মা বেঁচে থাকতে গল্প করতে করতে অনেকবার কথাগুলো বলেছে আমাকে। হাসতে হাসতে কথাগুলো শুরু করত মা, শেষে কাঁদতে কাঁদতে বলত, 'মানুষটার জন্য আমার সব সময় মায়া হয়, আমাকে ছাড়া এক দিন চলতে পারে না। জন্মের পর তোকে কোলে নিয়ে একটুও মন খারাপ করেনি তোর পা দেখে। কী একটা দোয়া পড়ে তোকে ফুঁ দিতে দিতে বলেছিল, আল্লাহ্পাক মানুষের সব আশা পূরণ করেন না, তবে বেশির ভাগ আশা পূরণ করেন। যাক, একটা মেয়ে চেয়েছিলাম, সেটা তো পেয়েছি।'

আমার অনেক দিন ইচ্ছে হয়েছে নূপুর দুটো ফেলে দিতে, কিন্তু দেওয়া হয়নি। বাবা খুব শখ করে জিনিস দুটো এনেছিলেন, পায়ে না পরতে পারি, হাত দিয়ে স্পর্শ তো করতে পারি। নূপুর দুটো যখন স্পর্শ করি, তখন মনে হয় আমি বাবার হাত স্পর্শ করে আছি।

মাঝে মাঝে চুপচাপ যখন আমার ঘরে শুয়ে থাকি, বাবা তখন নিঃশব্দে আমার ঘরে আসেন। বাবা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ দুটো বুজে ফেলি। পায়ের কাছে বসে আলতো করে বাবা আমার পায়ে হাত রাখেন,

অনেকক্ষণ ধরে রাখেন পা'টা, একসময় কাঁদতে থাকেন তিনি। আমি সবই টের পাই, কিছু বলি না। বাবার চোখের জল স্পর্শ করে আমার চোখ দুটোও। সে মুহূর্তে নীরবে কান্না করা ছাড়া কিছুই আর করার থাকে না আমার।

'কী রে, ও দুটো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' খালা এসে কখন যে আমার পিঠে হাত রেখেছেন, টেরই পাইনি। কিছুটা চমকে উঠে বললাম, 'খেয়েছ?'

'না।' খালা আমার পাশে বসে বললেন, 'তুই সারাক্ষণ কী ভাবিস, বল তো?'

'কিছু না খালা।'

'শোন, তোর খালুকে ফোন করে দিয়েছি। উনি কয়েকটা হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে আসবেন।'

'খালা-।'

খালা আমার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কিছু বলবি?'

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বল।'

'আজ না, অন্য দিন।'

কিছু কিছু ঘটনা আছে আমার, অনেকটা গল্পের মতো। মাঝে মাঝে ঘটনাগুলো মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায়।

পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রায়ই চিঠি লিখতাম আমি। সেগুলো ছাপাও হতো। পুরো ঠিকানাসহ ছাপা হওয়ায় অনেকেই চিঠি লিখত আমাকে। বেশ মজা লাগত চিঠিগুলো পড়তে। কিছু কিছু চিঠির উত্তর দিতাম। তবে চিঠিগুলো আমি একা একা লিখতাম না। বাবা বলে দিতেন, আমি তা শুনে শুনে লিখতাম।

পল্লব নামের একটা ছেলে বেশ ঘন ঘন চিঠি লিখত আমাকে। তার প্রতিটা চিঠিতেই কোনো না কোনো প্রশ্ন থাকত। তার প্রথম চিঠিতে একটা প্রশ্ন ছিল– নূপুর, বলুন তো মেয়েরা পায়ে নূপুর পরে কেন?

প্রশ্নটির উত্তর আমি দিয়েছিলাম। পরের চিঠিতে পল্লব লিখেছিল– আপনার উত্তরটা ঠিক না। যদি কোনো দিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, সেদিন আপনাকে বলব, মেয়েরা কেন পায়ে নূপুর পরে।

বেশ কয়েক দিন পর হঠাৎ একটা ছেলে বাসায় উপস্থিত। দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলল, 'এ বাসায় কি নূপুর নামে কেউ থাকে?'

আমি বললাম, 'নূপুরকে আপনি চেনেন?'

খুব মিষ্টি হেসে ছেলেটি বলল, 'ঠিক চিনি না, তবে জানি।'

'কীভাবে জানেন?'

'কীভাবে জানি?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করে ছেলেটি বলল, 'তা তো জানি

না!'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভেতর এসে সোফায় বসতেই ছেলেটিকে বললাম, 'আমি নূপুর, আর আমার যতটুকু মনে হচ্ছে, আপনি পল্লব।'

'কীভাবে জানলেন?'

'কীভাবে জানলাম?' পল্লবের মতোই নিজেকে প্রশ্ন করে বললাম, 'তা তো জানি না!'

হেসে ফেলল পল্লব, 'পত্রিকায় আপনি যতগুলো চিঠি লিখেছেন, তার অধিকাংশই মেয়েদের সমস্যা নিয়ে লেখা। আপনার চিঠিগুলো পড়ে মনে হয়, দেশে আর কোনো সমস্যা নেই, সব সমস্যা মেয়েদের।'

'আমি আমার, মানে আমাদের সমস্যাগুলো লিখি পল্লব। আমার মনে হয় পত্রিকায় প্রত্যেকে নিজের সমস্যাগুলোই লেখে। সেটা তার চলার পথের ভাঙা ব্রিজের কথা হতে পারে, সেটা নিকটতম কোনো জায়গায় চিঠি পোস্ট না করতে পারার অসুবিধার কথা হতে পারে, কিংবা আশপাশের কোনো বাসস্ট্যান্ড না থাকার বিড়ম্বনার ব্যাপারও হতে পারে। সমস্যা তো সমস্যাই, সেটা একজনের জন্য যেমন, সবার জন্য তেমনই।'

'আপনার কোনো কোনো চিঠিতে খুব ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও চলে আসে।'

'সমস্যাগুলো আমার না পল্লব। প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে একটা এনজিওর স্কুলে পড়াই আমি। সেখানে ছয় থেকে শুরু করে ষাট বছরের মহিলারাও পড়েন। তাদের একজন শিক্ষক হিসেবে তারা অনেক সমস্যার কথা বলেন আমাকে। আমি সে সমস্যার কথাগুলোই লিখি। পল্লব–।' আমি পল্লবের দিকে সরাসরি তাকিয়ে দেখি মুগ্ধ হয়ে শুনছে পল্লব।

'জি, বলুন।' পল্লব কিছুটা ধ্যান ভেঙে যাওয়া মানুষের মতো বলে।

'মেয়েদের সমস্যা শোনার মতো আসলে কেউ নেই পল্লব।'

'স্যরি, এ ব্যাপারটা কখনো ভেবে দেখিনি। সম্ভবত আপনার কাছে না এলে ব্যাপারটা জানতে পারতামও না। আচ্ছা, আমার প্রথম চিঠিটা আপনার মনে আছে?'

'আছে।'

'সেখানে একটা প্রশ্ন ছিল–।'

পল্লবের কথাটা কেড়ে নিয়ে আমি বলি, 'মেয়েরা নূপুর পরে কেন?'

'ঠিক।' পল্লব কিছুটা চুপ থেকে বলে, 'মেয়েরা নূপুর পরে নিজেকে শৃঙ্খলিত করার জন্য।'

অবাক হয়ে আমি পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলি, 'এটা কী বলছেন?'

'কয়েক শ বছর আগেও মেয়েদের হাতে-পায়ে পুরুষরা শেকল পরিয়ে রাখত, যাতে তারা কোথাও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারে, যদি চলাফেরা করেও তাহলে যেন শব্দ হয় যে তারা কোথায় যাচ্ছে। এতগুলো বছর পর সে শেকলগুলো চুড়ি আর নূপুরে রূপান্তরিত হয়ে মেয়েদের হাতে-পায়ে শোভা পায়।'

'আপনার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে।'

'মেয়েদের সেজে থাকার এত আয়োজন দেখে আমারও হাসি পায়।'

পল্লবের দিকে খুব গভীরভাবে তাকালাম আমি। কোথায় যেন একটা কষ্ট লুকিয়ে আছে ওর চোখে-মুখে। ওর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, 'একটা প্রশ্ন করব আপনাকে?'

একটু ভেবে পল্লব বলল, 'বলুন।'

'আপনার কষ্টটা আসলে কোথায়, বলুন তো?'

'আমার নিজস্ব কোনো কষ্ট নেই নূপুর, আমার কষ্ট আমার মাকে নিয়ে।'

'মাকে নিয়ে!'

'প্রতিদিন গভীর রাতে আমার বাবা মদ খেয়ে বাসায় ফেরে, আর আমার মা সে পর্যন্ত না ঘুমিয়ে জেগে থাকে বাবার জন্য। আমি জানি, বাবার জন্য মা অপেক্ষা করে আর কাঁদে। সেই মাকে যখন পরের দিন দেখি হাতে চুড়ি পরে শব্দ করতে করতে বাবার জন্য রান্না পাকাতে, রাগে আমার বুকটা ফেটে যায়। দাসত্বের একটা সীমা থাকা দরকার!'

'এটাকে আপনি দাসত্ব ভাবছেন কেন? এটা তো ভালোবাসাও হতে পারে।'

'ভালোবাসার রঙ আলাদা নূপুর।'

'চা খাবেন নিশ্চয়ই?'

'না।'

'কেন?'

'বলতে পারেন অভ্যাস।'

'আর কী কী অভ্যাস আছে আপনার?'

'নাহ্, নির্দিষ্ট কোনো অভ্যাস নেই আমার। নূপুর–।' একটু থেমে পল্লব বলল, 'একটা জিনিস নিয়ে এসেছি আমি আপনার জন্য।'

অস্ফুট স্বরে আমি বললাম, 'কী?'

'এক জোড়া নূপুর।'

'কেন?'

'আমার কেন যেন মনে হয় প্রতিটি নারীই আপাদমস্তকে শৃঙ্খলিত হতে চায়।'

'ভুল।'

'আমার আজন্ম কামনা– আমার এই মনে হওয়াটা যেন ভুল হয়, প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্ত।'

টেলিফোনটা বাজছে। আলমারিটা বন্ধ করে দ্রুত টেলিফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে একজন বললেন, 'তেজগাঁও থানা থেকে বলছিলাম।'

'বলুন।'

'ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম। আচ্ছা, আপনার বাবার মাথা কি এখন ন্যাড়া?'

'না তো!'

'অ আচ্ছা, রাখি।'

কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে রেখে দিল টেলিফোনটা। পাশ দিয়ে তাকিয়ে দেখি ছোট ভাইয়া আর ভাবি বাসায় ঢুকছে। আমি একটু এগিয়ে যেতেই ছোট ভাইয়া বলল, 'কেমন আছিস?'

আমি বললাম, 'আছি।'

'মন-খারাপ নাকি তোর?'

'বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কখন থেকে?'

'সকাল থেকে।'

ভাইয়া বিষয়টা তেমন পাত্তা না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে খেয়াল করলাম– কী অবলীলায় ভাইয়া ভাবির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। একটা মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে, নিজের বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না– একটুও চিন্তা হচ্ছে না তার, একটুও না।

বড় ভাবি ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমার ভাই তোমাকে ডাকে।'

জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাবির দিকে তাকালাম আমি। ভাবির শরীর থেকে তীব্র পারফিউমের গন্ধ আসছে।

আমি বললাম, 'কেন?'

'কী একটা জরুরি কথা আছে নাকি তোমার সঙ্গে।'

'তুমি যাও, আমি আসছি।'

ঘর থেকে বের হতে নিয়েই ভাবি ঘুরে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, আমার ওপর তুমি রেগে আছ নাকি?'

কিছুটা অবাক হয়ে আমি ভাবির মুখের দিকে তাকালাম, 'তোমার ওপর কি আমার রাগার কথা?'

'সেটা তো জানি না।'

'জানো না?' হাসতে হাসতে ভাবির কাছাকাছি গিয়ে বললাম, 'রাগ করার জন্য একটা অধিকার লাগে ভাবি।'

'সে অধিকার তোমার নেই?'

'কী জানি। ও, ভালো কথা, স্কুল থেকে অন্তু আজ একা একাই বাসায় ফিরেছে, জানো তো?'

'হ্যাঁ। ও বলল, ওদের নাকি কোন দারোয়ান মারা গেছে, তাই তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে।'

'অন্তু আজ মজার একটা কথা বলেছে।'

'কী?'

'ও নাকি বড় হয়ে গেছে, ওর আর কোনো কিছুতে ভয় লাগে না।'

'তাই নাকি!'

'কথাটা শুনে প্রচণ্ড হাসি পেয়েছিল আমার, আবার দুঃখও হয়েছিল।'

'কেন?'

ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রেখে বললাম, 'বড় হলেই মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায় তো, এমনকি তার বাবা-মাকেও।'

কিছুটা অবাক চোখে ভাবি আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। জানালা

দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম। সমস্ত আকাশটা সাদা, কোথাও একখণ্ড মেঘ নেই।

খারাপ লাগছে এখন, ভাবিকে ওভাবে কথাটা না বললেই পারতাম। কেন যে মাঝে মাঝে এভাবে কথা বলি! অথচ ছোটন কখনো এভাবে কথা বলত না। ও এমন মজা করে কথা বলত, কারো কোনো কিছু মনেই হতো না।

মার একবার প্রচণ্ড জ্বর। বাসায় আমিও নেই, ছোটনও নেই। বাবা অফিসে। মা একা একা শুয়ে আছে বিছানায়। আমি বাসায় এসেই দেখি ছোটন মাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপু, চল তো।'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

'বড় ভাইয়ার ঘরে।'

'কেন?'

'আহ্ চলই না!'

ভাইয়ার ঘরে ঢুকে ছোটন গলাটা খুব গম্ভীর করে বলল, 'ভাবি, তোমাকে একটা কথা বলব?'

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ভাবি ভাইয়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'কী কথা?'

'তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে ভাবি।'

'কী কাজ?'

'জরুরি একটা কাজ, তবে কাজটা তোমাকে বাকিতে করে দিতে হবে।'

'কাজটার কথা আগে বলো।'

'মার প্রচণ্ড জ্বর। ঘরে গিয়ে দেখি কাতরাচ্ছে। তুমি কি মার মাথায় একটু পানি ঢালবে?' ছোটন হাসতে হাসতে বলে, 'যদি আজ তুমি মার মাথায় পানি ঢালো, একদিন তোমার যখন প্রচণ্ড জ্বর হবে, সেদিন তোমার ছেলের বউ তোমার মাথায় পানি ঢেলে দেবে।'

ভাবি কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, 'এটা কী রকম কথা হলো!'

'গিফট অ্যান্ড টেক ভাবি, গিফট অ্যান্ড টেক।'

বড় ভাইয়ার ঘর থেকে বের হয়ে ছোটন ছোট ভাইয়ার ঘরে গেল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ভাবি কী যেন করছিল। ভাবির একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে ছোটন আয়নার ভেতর দিয়ে ভাবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবি, সুন্দর মানুষের সবচেয়ে বড় অসুবিধা কী, জানো?'

ছোট ভাবি আয়নার দিকে তাকিয়েই বলল, 'কী?'

'কারণে-অকারণে তাদের আয়না দেখতে হয়।'

'আমি সব সময় আয়না দেখি নাকি?'

'আমি তো তোমার কথা বলিনি ভাবি।'

'তাহলে?'

'আমি সুন্দর মানুষদের কথা বলেছি।' ছোটন মুখ টিপে হাসতে থাকে।

ছোট ভাবি কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল, 'কিছু বলবে?'

'একটা সমস্যার পড়েছি ভাবি।'

তুলোর সঙ্গে ওয়াশিং ক্রিম লাগিয়ে তা দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে ভাবি বলল, 'কী?'

'সমস্যাটা তোমাকে নিয়ে।'

ঝট করে আয়না থেকে ঘুরে দাঁড়াল ভাবি, 'আমাকে নিয়ে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে।'

'কী সমস্যা, বলো তো।' ভাবি অস্থির হয়ে যায়।

'এখন তো বলা যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ আছে।'

'কারণটা কী, বলো, শুনি।'

'না, সেটাও বলা যাবে না।'

'আহ্, এত কথা বলছ কেন তুমি, আসল কথাটা বলে ফেলো না।'

'বলব, তবে এখন না, তোমাকে পরে বলব কথাটা।'

ছোটন আর কিছু না বলে ছোট ভাইয়ার ঘর থেকে বের হয়ে এলো। আমি ওর পিঠে ছোট্ট একটা কিল দিয়ে বললাম, 'এটা কী হলো!'

'কিছু না আপা, একটু মজা করলাম। কিছুক্ষণ পর দেখবি, ভাবি আমার পেছনে ঘুরঘুর করছে, আমার আশপাশে হাঁটাহাঁটি করছে।'

মার জ্বর আরো বেড়ে গিয়েছিল। সেদিন সারাক্ষণ মার কাছে বসে ছিল ছোটন। কী অবাক কাণ্ড! ছোট ভাবিও সারাক্ষণ বসে ছিল মার আশপাশে। ছোট ভাবিই মার মাথায় পানি ঢেলেছিল সারাক্ষণ।

'ভাইয়া, ডেকেছ?'

কিছুটা গম্ভীর স্বরে ভাইয়া বলল, 'হ্যাঁ, আয় ভেতরে আয়।'

ভাইয়ার ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

ভাইয়া বেশ ইতস্তত করে বলল, 'আজ রাতে তোর ভাবিকে নিয়ে আমি একটু দেশের বাইরে যাচ্ছি। পাঁচ-সাত দিনের জন্য যাচ্ছি, জরুরি একটা কাজ পড়েছে। কয়েক দিন পর অন্তুর পরীক্ষা, ওকে তাই এবার নিয়ে যাচ্ছি না। তুই কি ওকে একটু দেখে রাখতে পারবি?'

'হ্যাঁ, পারব।'

'মাত্র তো পাঁচ-সাত দিন, পারলে দু-এক দিন আগেও চলে আসতে পারি।'

'ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হবে না।'

'তুই কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করছিস?'

ছোটনের কথা মনে পড়ে গেল আবার। ছোটন হলে এ প্রশ্নটার কী উত্তর দিত। আমি ভাইয়ার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, 'না।'

'ও, ভালো কথা, বনসাইটাকেও একটু দেখে রাখিস তো।'

'রাখব।'

'দামি গাছ তো, একটু-আধটু যত্ন কম হলেই বিগড়ে যায়।'

'ভাইয়া, আমি এখন যাই?'

'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম। বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল?'

'না।'

'রাজীব বাসায় ফিরেছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'ও কোথায়?'

'ছোট ভাইয়া সম্ভবত ঘুমাচ্ছে।

ভাইয়ার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম আমি। হঠাৎ দেখি তুপা বসে আছে আমার বিছানায়। আমি প্রচণ্ড অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি!'

'স্যরি আপু, অনেক দিন পর আসতে হলো আমাকে।'

'পরীক্ষা কেমন হলো।'

'ভালো।' তুপা একটু উঠে এসে আমার হাতটা ধরে পাশে বসিয়ে বলল, 'তিন দিন পর ছোটনের জন্মদিন, তোমার মনে আছে আপু?'

'সেটা কি ভুলে যাওয়ার কথা?'

'আপু, তুমি কি জানো ছোটনের সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হয়েছিল?'

'না।' আমি তুপার একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'ছোটন আমাকে প্রায় সব কথাই বলত, কিন্তু একটা অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, ও তোমার কথা তেমন কিছু বলত না।'

'কারণ আছে আপু।'

'কী?'

'মানুষের অসহায়ত্বের কথা হয়তো ও কাউকে বলতে চাইত না।'

আমি কিছুটা হাসতে হাসতে বলি, 'তুমি অসহায়?'

'প্রতিটা মানুষই অসহায় আপু।' তুপা একটু থেমে বলে, 'সম্ভবত মেয়েরা একটু বেশি।'

'হয়তো।'

কয়েক বছর আগের কথা, ছোটন একদিন ঘেমে-টেমে বাইরে এসে হঠাৎ বলল, 'আপু, কিছু টাকা হবে?'

আমার কাছে কখনো কেউ টাকা চাইবে, এটা কখনো ভাবিনি আমি। আমি অবাক হয়ে ছোটনকে বললাম, 'কত টাকা?'

'এই হাজার দেড়েক।'

'এত টাকা দিয়ে তুই কী করবি?'

'জরুরি একটা কাজ আছে আপা।'

'এখনই লাগবে?'

'হ্যাঁ, এখনই। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কিসের সর্বনাশ!'

'আপু, পরে বলি কথাটা, আগে বলো টাকা হবে কি না?'

আমি আমার সমস্ত সঞ্চয় বের করে দেখি মাত্র এগার শ ষাট টাকা আছে আমার কাছে। কিছুটা লজ্জা নিয়ে আমি ছোটনের হাতের দিকে টাকাগুলো এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এগার শ ষাট টাকা আছে রে, আর–।'

কথাটা শেষ করতে দিল না ছোটন। তাই আগেই টাকাগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে ছোটন বলল, 'আপাতত এটা দিয়ে হবে, আমার কাছেও কিছু আছে, হয়ে যাবে।' তারপর দ্রুত ও বাসা থেকে বের হয়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরল ছোটন। ওর মুখটা বেশ হাসি হাসি লাগছিল তখন। আমি ওর ঘরে গিয়ে মাথায় আলতো হাত রেখে বললাম, 'সর্বনাশটা ঠেকানো গেছে?'

ছোটন বেশ জোর করে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'থ্যাংকু আপু, টাকাগুলো তুমি না দিলে ভীষণ সর্বনাশ হয়ে যেত।'

'কী ধরনের সর্বনাশ হতো সেটা কি আমাকে একটু বলা যাবে?'

'তার আগে এক কাপ চা খাব আপু।'

চা বানিয়ে এনে ছোটনের সামনে রাখতেই ও মুখটা গম্ভীর করে বলল, 'বুয়েটে ভর্তি হওয়ার আজ শেষ দিন ছিল।'

'তুই তো পরশুদিন ভর্তি হয়ে এসেছিস।'

'হ্যাঁ। আজ এমনি একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, ভর্তিরুমের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে কাঁদছে।'

'কেন?'

'সেটাই তো তোমাকে বলছি।' বেশ তৃপ্তি নিয়ে চায়ে চুমুক দিল ছোটন।

'চা কেমন হয়েছে?'

'এ প্রশ্নটার কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না আর।'

'কেন?'

'তোমার চা কবে খারাপ হয়েছে?'

আমি ওর মাথায় চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, ওই

মেয়েটার কথা বল।'

ছোটন চায়ে আবার চুমুক দিয়ে বলল, 'খুব খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা দেখতে। আমি বেশ ইতস্তত করে তার কাছে গিয়ে বললাম, আপনার কোনো সমস্যা? মেয়েটা অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না। গুমরে গুমরে কাঁদতে কাঁদতে শেষে বলল, বুয়েটে আজ ভর্তি হওয়ার শেষ দিন।'

'তো?'

'কিন্তু আমি ভর্তি হতে পারছি না।'

'কেন?'

'আমার বাবার আজ টাকা নিয়ে আসার কথা, কিন্তু এখনো আসেননি।'

'আপনারা বাবা কোথায় থাকেন?'

'দিনাজপুরে।'

'আপনি?'

'প্রীতি মহিলা হোস্টেলে।'

'আপনার বাবা বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন।'

'বাবা আসলে এতক্ষণ এসে যেতেন, সম্ভবত কোনো অসুবিধা হয়েছে বাবার।'

'আচ্ছা আমি যদি সাহায্য করি আপনাকে, আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো? কথাটা শোনার পর মেয়েটা ভাবলেশহীনভাবে আমার দিকে তাকাল। এত খারাপ লাগল আমার!'

অনেক ছোটখাটো বিষয় নিয়েই মন খারাপ হয়ে যেত ছোটনের। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকরা প্রায় সব সময় মিথ্যে কথা বলে। প্রচণ্ড এক শীতে এক ফকির এসে বলল, বাবা, মারা যাচ্ছি শীতে, আমার কোনো শীতের কাপড় নেই। ছোটনের মন খারাপ হয়ে গেল কথাটা শুনে। সাত-আট দিন আগে কেনা ওর নতুন সোয়েটারটা নির্দ্বিধায় দিয়ে দিল ফকিরটিকে। বিকেলবেলা ফার্মগেটের কাছে গিয়ে ও আবার দেখে, ওই সোয়েটারটা বিক্রি করার চেষ্টা করছে ফকিরটি। এ ব্যাপারটা নিয়েও মন খারাপ হয়ে গেল ওর।

'আপু, যদি ছোটন নামে কেউ একজন না থাকত, তাহলে আমাকে হয়তো আজ এখানে দেখতে পেতে না।' তুপা ছলছল চোখে বলল, 'তুমি কি জানো, বুয়েটে ভর্তি হওয়ার সমস্ত টাকা ও আমাকে দিয়েছিল?'

'আমি জানি।'

'ও যে মাঝে মাঝেই আমাকে টাকা দিত, এটা জানতে?'

'হ্যাঁ।'

'একদিন প্রচণ্ড পেটব্যথা আমার। কথা শুনে ওর কী অস্থিরতা! পারলে আমাকে তখনই হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওর অস্থিরতা দেখে আমি প্রচণ্ড হেসে

বলেছিলাম, ছোটনবাবু, মাসের একটা সময় মেয়েদের পেটব্যথা হয়। এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না তো! কথাটা শুনে ও কী বুঝল জানি না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।' তুপা আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, 'আপু, এক বছরের জন্য আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'একটা স্কলারশিপ পেয়েছি।'

'খুব ভালো।'

'ছোটনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে বেশ মজা করে প্রতিবার জন্মদিন পালন করতাম আমরা। ও মারা যাওয়ার পর আমি একা একা পালন করতাম সেটা। ও যেসব জায়গায় ঘুরতে পছন্দ করত, সে জায়গাগুলোতে আমি একা একা ঘুরতাম। আপু, তুমি কি ছোটনকে চিনতে?' তুপার চোখ টলটল করছে, 'এ রকম একটা নিঃস্বার্থ ছেলে পৃথিবীতে আর একটাও নেই আপু। বন্ধুত্বের সংজ্ঞা লিখতে হলে আগে ছোটনের কথা লিখতে হবে। ও যদি কোনো দিন আমাকে বলত, তুপা, তোমার চোখ দুটো আমাকে দাও তো, আমি এক মুহূর্তও ভাবতাম না। আমার জীবনের সমস্ত আয়োজন আমি ওর জন্য রেখেছিলাম, কিন্তু ও কোনো দিন কিছু চায়নি আমার কাছে।'

'আমি জানি তুপা, ছোটন তো আমারও বন্ধু ছিল।'

'আপু, ছোটনের এবারের জন্মদিনে আমি দেশের বাইরে থাকব, খুব খারাপ লাগছে। ও যে বিছানায় ঘুমাত, আমি আজ ওর সে বিছানায় কিছুক্ষণ বসে থাকব আপু।'

বাবার ঘরে দুটো খাট আছে। একটাতে বাবা ঘুমায়, আরেকটাতে ছোটন। বাবার ঘরে ঢুকেই তুপা বলল, 'আংকেল কোথায়?'

'বলছি। আচ্ছা, তুমি কি চা খাবে তুপা?'

'জি আপু খাব।'

'তুমি বসো, আমি চা নিয়ে আসছি।'

বিছানায় বসতে বসতে তুপা বলল, 'বললে না, আংকেল কোথায়?'

ঘর থেকে বের হতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সকাল থেকে বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তুপা।'

কিছুটা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল তুপা, 'এটা কী বললে আপু! হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়েছ?'

'কয়েকটাতে নিয়েছি।'

'পুলিশকে জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের আর কেউ বাইরে যায়নি খুঁজতে?'

'না।'

'এসব কী বলছ আপু!' অদ্ভুত শব্দ করে কেঁদে ওঠে তুপা, 'একটা বৃদ্ধমানুষ সারা দিন বাসায় নেই, কারো মাথাব্যথা নেই এতে!' তুপা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমার শিক্ষক বাবা, অনেক সময়ই আমাকে প্রয়োজনীয় টাকা দিতে পারতেন না। ছোটন বেঁচে থাকতে প্রায়ই আমার অভাবী সময়ে সাহায্য করত। কোনো দিন ও ওর টিউশনির সমস্ত টাকা আমাকে দিয়ে দিত। ছোটন মারা যাওয়ার পর মাঝে মাঝে আমাকে কে টাকা দিত, জানো?'

'কে?'

'তোমার বাবা। পাশাপাশি দু খাটে ঘুমাতে ঘুমাতে আংকেলকে হয়তো আমার গল্প করত ছোটন। একদিন হঠাৎ আমার হলের গেটে দেখি আংকেল। কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনি আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, মনে করো ছোটন দিয়েছে। সেদিন আংকেল আমাকে একটা আইসক্রিম কিনে দিয়েছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে আমি আইসক্রিম খাচ্ছিলাম আর আংকেল আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। বাবারা এত মমতাময় হয় কেন আপু!'

খুব গোপন একটা ইচ্ছে ছিল বাবার। কেউ জানত না, বাবা কাউকে বলতেনও না। বাবার সঙ্গে আমার এই যে এত কথা হয়, বলতেন না আমাকেও। কিন্তু বাবার সে গোপন ইচ্ছেটার কথা জেনে ফেলেছিলাম আমি।

মা বেঁচে থাকতে বাবা প্রায়ই বলতেন, 'সজীবের মা, একদিন একটা জিনিস দেব আমি তোমাকে।'

হাসতে হাসতে মা বলত, 'আপনি তো আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছেন।'

'ঠাট্টা করছ কেন সজীবের মা।'

বাবার একটা হাত ধরে মা ছলছল চোখে বলত, 'বলেন তো, আপনি আমাকে অনেক কিছু দেননি?'

'কই দিতে পারলাম তোমাকে। ভালোবেসে মানুষ তার স্ত্রীকে কত কিছু দেয়, কিন্তু কই, আমি দিতে পারলাম তোমাকে!'

চোখে জল নিয়েই মা হাসতে হাসতে বলত, 'আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন? আপনি তো আমাকে ভালোবাসেন না।'

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বাবা বলতেন, 'ঠিকই বলেছ, আমি বোধহয় তোমাকে ভালোবাসি না।'

'মন খারাপ করে ফেললেন।' বাবার হাতটা আরো চেপে ধরে মা বলত, 'আপনি আমাকে সত্যি সত্যি অনেক কিছু দিয়েছেন সজীবের বাবা। আপনি আমাকে তিন-তিনটা ফুটফুটে ছেলে দিয়েছেন, যদিও আল্লাহ্ একটা নিয়ে গেছেন। একটা গুণবতী মেয়ে দিয়েছেন। আমার আর কিছু লাগবে না।'

'আমি একজন দরিদ্র-অভাবী মানুষ। আমরা যে এই জায়গাটাতে থাকি, আমার দাদা কিনেছিলেন এটা। মারা যাওয়ার আগে বাবা আবার আমাকে এটা দিয়ে গেছেন। আমার সারা জীবনের একটা ইচ্ছে আছে সজীবের মা। এই জায়গাটা আমি তোমাকে লিখে দেব, তারপর এখানে একটা বাড়ি করব আমি। বাড়িটার একটা নামও রাখা হবে।' মার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাবা বলতেন, 'আচ্ছা, বলো তো বাড়িটার নাম কী হবে?'

মা অস্পষ্ট স্বরে বলেছিল, 'কী?'

'সুফিয়া মঞ্জিল।'

মা ভীষণ চমকে উঠে বলে, 'এটা কী বলছেন আপনি!'

'আমার বহুদিনের শখ এটা। মানুষজন আমাদের বাড়িটার সামনে দিয়ে যাবে, আর বাড়িটার নাম দেখবে। তারা শুধু বাড়িটার নামই দেখবে, কিন্তু জানবে না, ওই নামের মহিলাটা অত্যন্ত গুণবতী একটা মহিলা ছিলেন।'

বাবা আর মা প্রায়ই এ ধরনের গল্প করতেন। মাঝে মাঝে বাবা এত শব্দ করে হেসে উঠতেন, ভীষণ চমকে উঠতাম আমি। অনেক সময় প্রচণ্ড রোমান্টিক কথাও বলতেন বাবা। তাদের পাশের ঘরে এই যে আমি থাকি, আমি যে সব কথাই শুনতে পাই, এটা ভুলে যেতেন তারা মাঝে মাঝে।

বেশ রাত করে বড় ভাইয়া আর ছোট ভাইয়া একদিন বাবার ঘরে এলো। বাবা শুয়ে ছিলেন। মা নামাজ পড়ছিল। বাবা ভাইয়াদের দেখে বিছানায় উঠে বসে বললেন, 'কিছু বলবে?'

বড় ভাইয়া কিছুটা লাজুক স্বরে বলল, 'জি বাবা।'

'বসো।' বাবা একটু থেমে বললেন, 'বিষয়টা কি পারিবারিক?'

ছোট ভাইয়াও বড় ভাইয়ার মতো লাজুক স্বরে বলল, 'জি।'

'তোমরা তাহলে নূপুরকেও ডাকো। আমার মনে হয়, ওরও তাহলে এখানে থাকা উচিত।'

ছোট ভাইয়া আমাকে ডেকে নিয়ে গেলে আমি বাবার পাশ-ঘেঁষে বসলাম। মাও নামাজ শেষ করে বাবার পাশে এসে বসল। বাবা চশমার দিকে হাত বাড়াতেই আমি চশমাটা নিয়ে ওড়না দিয়ে মুছে দিলাম। চোখে পুরতে পুরতে বাবা বললেন, 'বলো।'

'আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাবা।' বড় ভাইয়া আগের মতোই লাজুক স্বরে বলল।

'আমরা মানে কারা, তোমরা দু ভাই?'

'জি বাবা।'

'সিদ্ধান্তটা বলো।'

'আমরা একটা পাঁচতলা বিল্ডিং বানাতে চাইছি বাবা, যদিও আপাতত দু তলা বানাব।'

'পাঁচতলা বিল্ডিং? ভালো তো, বানাও।'

'কিন্তু–।' বড় ভাইয়া কথাটা শেষ করল না।

'কথাটা শেষ করো।'

ছোট ভাইয়া একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'তার জন্য আমাদের এ জায়গাটা লাগবে।'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি ভাইয়াদের দিকে তাকালেন, 'আমি তো জানি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তোমাদের

অনেক টাকা হয়েছে। তোমরা নিজেরাই তো একটা জায়গা কিনতে পার।'

'অত টাকা আমাদের হয়নি বাবা।' বড় ভাইয়া মাথা নিচু করে বলল।

'অত টাকা তোমাদের হয়নি, তাহলে বিল্ডিং বানাবে কী দিয়ে।'

'লোন নেব আমরা।'

'লোন নেবে?'

'জি বাবা।' ছোট ভাইয়া বলল।

'কোথা থেকে নেবে?'

'ব্যাংক থেকে।'

'ব্যাংক তোমাদের লোন দেবে?'

'দেবে।' বড় ভাইয়া কিছুটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'তার জন্য জায়গা মর্টগেজ রাখতে হবে।'

ভাবলেশহীনভাবে ভাইয়াদের দিকে তাকালেন বাবা। ভাইয়ারা মাথা নিচু করে আছে। বাবাও মাথাটা নিচু করে ফেললেন। বেশ কিছুক্ষণ পর বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

ভাইয়ারা ঘর থেকে চলে যেতেই মা বলল, 'আপনি এ জায়গাটা ওদের নামে লিখে দেন।'

বাবা কিছুটা রেগে গিয়ে বললেন, 'কেন?'

'একদিন তো জায়গাটা ওদেরই দিতে হবে। তাই আগেভাগেই দিয়ে দেওয়া ভালো।'

'আমার একটা স্বপ্ন ছিল সজীবের মা।'

'আমি জানি।'

'তাহলে?'

বাবার দিকে এগিয়ে এসে মা বলে, 'ওরা ভালো থাকুক, এটা তো আপনি চান। চান না?'

'কিন্তু–।'

'কোনো কিন্তু না, আপনি দু-এক দিনের মধ্যে ওদের নামে জায়গাটা লিখে দেন।'

সেদিন রাতে বাবা একদম ঘুমাননি। মাঝরাতের দিকে ঘুম ভাঙতেই শুনি–কার যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বারান্দায়। কিছুটা চমকে উঠে গিয়ে দেখি, মাথা নিচু করে বারান্দায় পায়চারি করছেন বাবা। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালেন। আমি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বাবা, আপনি প্রায়ই একটা কথা বলেন।'

'কী কথা রে মা?'

'মানুষকে কিছু দেওয়ার মাঝেই সবচেয়ে সুখ।'

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি ভাইয়াদের জায়গাটা দিয়ে দেন।’

‘আমি যে জায়গাটা তোর মাকে দিতে চেয়েছিলাম!’

‘মা জায়গা নিয়ে কী করবে। তা ছাড়া মা-ই তো বলল জায়গাটা দিয়ে দিতে।’

বাবা আমার মাথায় হাত রাখলেন। বাবা প্রায়ই আমার মাথায় হাত রাখেন। প্রতিবার মাথায় হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে যায় চোখে। নিজেকে কখনোই তেমন অসহায় মনে হয় না আমার, কেবল বাবা যখন মাথায় হাত রাখেন, তখনই মনে হয় আমি অসহায়। অথচ একদিন এ হাতটা কখনো আর স্পর্শ করবে না আমাকে।

‘বাবা, চা খাবেন?’

‘এত রাতে চা!’

‘আমার খেতে ইচ্ছে করছে বাবা।’

ফজরের নামাজের আজান দেওয়া পর্যন্ত সেদিন আমরা গল্প করেছিলাম। গল্প করতে করতে বাবা এ সময় ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, ‘তুই কি জানিস, আমার সব চিন্তা এখন তোকে নিয়ে?’

‘কেন বাবা?’ বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখটা হাসি হাসি করে বলেছিলাম, ‘আমি অচল বলে?’

খুব দুখি দুখি চেহারা করে বাবা বললেন, ‘না, তুই আমার বন্ধু বলে।’

বেশ শব্দ করে শিউলী ঘরে ঢুকল। চমকে উঠলাম আমি। বেশ বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘এমন শব্দ করে হাঁটছিস কেন?’

‘আপা, একটা বিদেশী আসছে আপনার কাছে।’

‘বিদেশী?’

‘জি।’

দ্রুত বিছানা থেকে নেমে ড্রইংরুমে গিয়েই চোখ দুটো বড় হয়ে গেল আমার। ব্রাউন মরিস বসে আছে সোফায়। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, ‘খোকি, আজ ইস্কুলে আসোনি খেন?’

ব্রাউন মরিসের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকালাম আমি। অস্ট্রেলিয়ান এই ভদ্রলোকের উচ্চতা প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। ষাটোর্ধ্ব বয়সেও কী চমৎকার স্বাস্থ্য তার। তেইশ বছর ধরে তিনি বাংলাদেশে আছেন, শিশু ও নারীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তার করা স্কুলেই পড়াই আমি।

মরিসের সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম দেখা, সেদিন থেকেই তিনি আমাকে খোকি বলে ডাকেন। এ কয়েক বছরে বেশ ভালো বাংলা শিখেছেন তিনি। খুকি বলতে না পারলেও খোকি বলে ডাকেন আমাকে। কোনো কোনো দিন আমরা

এত গল্প করি, মরিসের স্ত্রী জনাও যোগ দেন আমাদের আড্ডায়। নিঃসন্তান এই দম্পতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দিন কেটে যায়, এমন ঘটনা বহুদিন ঘটেছে। মরিস হঠাৎ একদিন আমাকে খুব কাতর গলায় বললেন, 'খোকি, টুমি কি আমার ডটার হবে?'

অবাক হয়ে আমি বলি, 'আমি কি তোমার ডটার নই?'

'টুমি আমার ডটার?' আনন্দে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন মরিস। জনাও আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'টুমি টাহলে আমাকে মাম বলে ডাকো, মরিসকে ড্যাডি বলে ডাকো।'

আমি আমার নতুন মায়ের মাথাটা কাঁধের সঙ্গে চেপে ধরে ফিস ফিস করে বললাম, 'মা।'

আনন্দে কেঁদে ফেলেন জনা। সামনাসামনি কোনো বিদেশীকে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি, সেদিন দেখেছিলাম। সব মানুষের হাসির মতো সব মানুষের কান্নাও প্রায় এক। কিছুক্ষণ পর জনা তাদের বিশাল ফ্রিজ থেকে মস্ত একটা কেক বের করে বললেন, 'খোকি, সব খাবে টুমি আজ, সব খাবে।'

ড্রইংরুমে গিয়ে দেখি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন মরিস। আমাকে দেখে মুখটা হাসি হাসি করে এগিয়ে এসে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। আমি বললাম, 'স্যরি, আমার একটা সমস্যা হয়েছে মরিস।'

সঙ্গে সঙ্গে বেশ উদ্বিগ্ন হলেন মরিস। আমার কপালে হাত রাখলেন তিনি, 'তোমার অসুখ খরেছে?'

'না।'

'টাহলে?'

'সকাল থেকে আমার বাবাকে খুঁজে পাচ্ছি না মরিস।'

'হোয়াট!' আশ্চর্য হয়ে মরিস বললেন, 'এটা টুমি খী বলছ? কোঠায় গেছেন টোমার বাবা।'

'তা তো জানি না।'

'খুঁজে ডেখনি?'

'কয়েকটা হাসপাতালে খুঁজেছি, পাইনি।'

'পুলিশকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'পুলিশ খুঁজে দেয়নি?' প্রচণ্ড অবাক হয়ে মরিস বললেন।

'তারা খুঁজছে।'

'আমি খুঁজে ডেখব। টোমার ড্যাডকে টো আমি ডু'বার ডেখেছি। চিনতে পারব টাকে।' মরিস উঠে দাঁড়ালেন। একটু এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মরিস, 'খোকি, টোমার মাম টোমার জন্য মন-খারাপ খরে আছে।'

আমি মন-খারাপ করে বললাম, 'কেন?'

'টোমাকে আজ ডেখেনি টো!'

'মামকে বোলো, আমি খুব তাড়াতাড়ি মামের বানানো কেক খেতে আসব।'

'আসবে টো!' অবিশ্বাসীর মতো কথাটা বললেন মরিস।

'অবশ্যই।'

বাবার মতো জড়িয়ে ধরে মরিস আমার সমস্ত বাঙালি অসংকোচ সরিয়ে দিয়ে কুঁজো হয়ে আমার কপালে তার কপাল ঠেকিয়ে বললেন, 'খোকি, টুমি টো আমার ডটার। আমি টোমার ড্যাড, না?'

মাথাটা উঁচু-নিচু করে আমি বললাম, 'হ্যাঁ ড্যাড।'

'টুমি খিছু চিন্টা কোরো না, আমি টোমার ড্যাডকে খুঁজে বের করব।'

পকেট থেকে অনেকগুলো চকলেট বের করে আমার হাতে দিয়ে চলে গেল মরিস। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। মরিসের গাড়িটা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইলাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি অন্তু দাঁড়িয়ে। ভীষণ মন-খারাপ করে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওর হাতে চকলেটগুলো দিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে বাবা?'

'ভালো লাগছে না ফুপুমণি।'

'কেন?'

'দাদু নেই, খেলতে পারছি না।'

'চলো, টিভি ছেড়ে দিই।'

'না।'

'কার্টুন দেখবে?'

'কার্টুন দেখতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিছু খাবে?'

'খেতেও ইচ্ছে করছে না।'

'তোমার বাবা-মা যে আজ বিদেশে যাচ্ছে, জানো?'

'হ্যাঁ, আম্মু আমাকে বলেছে।'

'তোমার মন খারাপ হয়ে যায়নি?'

'না। আমার এখন দাদুর জন্য মন খারাপ।' অন্তু আমাকে কিছুটা আঁকড়ে ধরার মতো করে বলল, 'আচ্ছা ফুপুমণি, দাদু আর আসবে না?'

বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে আমার। হঠাৎ কেমন যেন নিঃশব্দ হয়ে যায় চারদিক। চারদিক একেবারে ফাঁকা, সবকিছু অর্থহীন। এক ধরনের ক্লান্তি এসে ভর করে শরীরে। ঠিক তখনই আমারও মনে হলো– বাবা কি আর আসবেন না? শিরদাঁড়া বেয়ে কেমন যেন একটা অনুভূতি নেমে যায় শিরশির করে।

অন্তু আমার হাঁত ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বলে, 'বললে না, দাদু আর আসবে কি না?'

অন্তুর মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে আমি বলি, 'জানি না রে বাবা।'

'কেন জানো না।' অন্তু রেগে যায়, 'তোমরা দাদুকে খুঁজে আনো না কেন?'

'খুঁজেছি আমরা।'

'কিচ্ছু খোঁজোনি তোমরা।'

হাতের চকলেটগুলো মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে অন্তু চলে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি অনেকক্ষণ। নিজের ভেতর কী যেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, অনুভব করছি তার ক্ষত-বিক্ষত অনুভূতিগুলো।

বাবার ঘরে গিয়ে দেখি খালা নামাজ পড়ছেন। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে খালা বসে আছেন জায়নামাজে। আমাকে দেখেই বললেন, 'তোদের এনজিও স্কুলের সেই বিদেশী ভদ্রলোক এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'চলে গেছেন তিনি?'

'একটু আগেই গেলেন।'

'তোর খালু ফোন করেছিল। কয়েকটা হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছে, দুলাভাইকে পাওয়া যায়নি। একটু পর বাসায় আসবে, তার আগে তেজগাঁও থানা থেকে নাকি ঘুরে আসবে।'

'আমরা কি আবার একটু বাইরে যাব খালা?'

'না। আমি একটু হাইকোর্টের মাজারে যাব, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসব।'

'খালা–।'

খালা দুখি দুখি চেহারায় আমার দিকে তাকালেন, 'কিছু বলবি?'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে বাবা আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।'

কিছু না-বলে বাসা থেকে বের হয়ে গেলেন খালা। বিকেল হয়ে আসছে। জানালার পাশে আমাদের নারকেলগাছটাতে অনেকগুলো চড়ুইপাখি এসে চেঁচাচ্ছে। কারণ, ওদের আজ খাবার দেওয়া হয়নি। বাবা প্রতিদিন দুপুরে ওদের জন্য এক বাটি ভাত রেখে দেন সানশেডের ওপর।

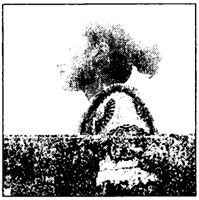

টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছে, কিন্তু রিসিভ করছে না কেউ। কাউকে দেখাও যাচ্ছে না ড্রইংরুমে। বেশ কিছুক্ষণ পর দৌড়ে এসে শিউলী বলল, 'আপা ফোন।'

'তুই ধরতে পারিস না!' ভীষণ রাগ হলো শিউলীর ওপর।

'সকালে আপনাকে বললাম না!' শিউলী মুখটা ম্লান করে বলল, 'বড় ভাবি আমাকে ফোন ধরতে মানা করেছে!'

'কেন মানা করেছে?'

'আমি কী জানি।'

'আমি কী জানি মানে? কেন মানা করেছে তুই জানিস না, না?' কিছুটা চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'টেলিফোনে মাঝে মাঝে কার সঙ্গে কথা বলিস তুই?'

'কার সঙ্গে বলি?'

'আমি তো সেটাই জিজ্ঞেস করেছি।' শিউলীর চোখের দিকে তাকালাম আমি, 'টেলিফোন ধরেই নাকি ফিস ফিস করে কথা বলিস?'

মাথা নিচু করে ফেলল শিউলী। আমি আরো একটু শব্দ করে বললাম, 'কথা বলছিস না কেন?'

'আমি আর টেলিফোন ধরব না, টেলিফোনে কথাও বলব না।'

'কথা বলতে তো কোনো দোষ নেই, কিন্তু ফিস ফিস করে বলিস কেন? ফিস ফিস করে কারা কথা বলে, জানিস?'

চোখ দুটো তুলে শিউলী আমার দিকে তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলল আবার। টেলিফোনটা এখন আর বাজছে না।

ভাবি কেন শিউলীকে টেলিফোন ধরতে দেয় না, সেটা আমি জানি। মনোয়ারা নামে আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল। ভীষণ চটপটে ছিল ও। সারাক্ষণ কাজ করত আর হাসত, কখনো মন-খারাপ করতে দেখা যায়নি ওকে। ও আমাদের বাসায় আসার পর থেকে আমরা প্রায় টেলিফোন রিসিভই করতাম না। মনোয়ারাই রিসিভ করত সব সময়।

চমৎকার করে কথা বলতে পারত মনোয়ারা, আর বাসায়ও থাকত বেশ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে। বেশ স্টাইল জানত ও। মাঝে মাঝে ওকে দেখে মনেই হতো না ও আমাদের বাসায় কাজ করে।

আমাদের বাসায় তিন গলি পর একজন ডাক্তার সাহেব থাকতেন। খুবই নামী এবং দামি ডাক্তার। তার এক ছেলেকে নিয়ে তিনি হঠাৎ একদিন আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। আমরা তো অবাক, ডাক্তার সাহেব কেন আমাদের বাসায়। সোফায় বসতে বসতে তিনি বাবাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা সম্বন্ধের কথা বলতে এসেছি আমি।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে সম্বন্ধ! ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'এটা আমার একমাত্র ছেলে।' ডাক্তার সাহেব তার পাশে বসা ছেলেটাকে দেখিয়ে বললেন, 'খুব ভালো ছাত্র আমার এ ছেলেটা, কিন্তু একটু বোকা বোকা ধরনের। আমি ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের সম্বন্ধ করতে চাই।'

'আমার মেয়েকে আপনি দেখেছেন!' বাবা আরো অবাক হয়ে যান।

'আমি দেখিনি, তবে আমার এ ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের নিয়মিত কথা হয়।'

'কোথায় কথা হয়?'

'টেলিফোনে।'

'তাই নাকি!'

'কাল আপনার মেয়ে আমার ছেলেকে বলেছে তার নাকি অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তার পর থেকে তো ও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।'

'আপনি সঠিক বাসায় এসেছেন তো ডাক্তার সাহেব?'

'কেন, এটা ৬৩ নম্বর বাসা না?'

'জি।'

'আপনার মেয়ের নাম–।' ডাক্তার সাহেব নামটা মনে করতে নিয়েই ভুলে গেলেন। তিনি ছেলের দিকে তাকালেন, 'কী যেন নাম মেয়েটার?'

ছেলেটা লাজুক স্বরে বলল, 'মনোয়ারা।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললেন বাবা। একটু পর বাবা কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে ডাক্তার সাহেবকে বললেন, 'আগে আমরা একটু চা-পানি খাই, তারপর কথা বলি?'

চা-নাশতা করানোর পর বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ পর বললেন, 'এবার আপনার মতামত বলুন। আপনার মেয়েটাকে কি একবার দেখানো যাবে?'

'তা যাবে। তবে–।' বাবা কথা শেষ করলেন না।

'কোনো সমস্যা?'

'ঠিক সমস্যা না, একটু মুশকিলে পড়েছি আমি।'

‘ব্যাপারটা কি আমাকে বলা যাবে?’

‘তা যাবে। তবে আজকে বলতে চাইছি না।’ বাবা মুখটা হাসি হাসি করার চেষ্টা করলেন, ‘দু-এক দিনের মধ্যে আমি যদি আমার মতামতটা আপনাকে জানাই, তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে?’

‘সমস্যা আমার হবে না।’ ডাক্তার সাহেব ছেলের দিকে তাকালেন আবার, ‘সমস্যা তো অন্য জায়গায়। ঠিক আছে, দয়া করে দু-এক দিনের মধ্যে আমাকে জানাবেন, প্লিজ।’

ডাক্তার সাহেব চলে যাওয়ার পর বাবা মনোয়ারাকে ডাকলেন, সঙ্গে বড় ভাবিকেও। কারণ মনোয়ারাকে বড় ভাবিই তাদের গ্রাম থেকে আমাদের বাসায় এনেছিল। বাবা খুব মমতা নিয়ে মনোয়ারার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, ‘মানুষের মন এক জিনিস, আর বাস্তবতা অন্য জিনিস।’ বাবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে মনোয়ারার দিকে তাকালেন, ‘মা রে, আমি দোয়া করি তোর এর চেয়েও ভালো বিয়ে হোক।’ বাবা বড় ভাবিকে বললেন, ‘আমি কোনো কথা বলতে পারব না, তুমি ডাক্তার সাহেবকে একটু বুঝিয়ে বোলো।’

পরের দিন ভাবি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিল। এর পরও অনেক দিন ডাক্তার সাহেবের ছেলেটা ফোন করেছিল আমাদের বাসায়। একদিন বাসায়ও এসেছিল সে। তারপর ভাবি আর মনোয়ারাকে আমাদের বাসায় রাখেনি, গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কলবেলটা বেজে উঠল হঠাৎ। শিউলী দরজা খুলে দেওয়ার জন্য পা বাড়াতেই আমি বললাম, ‘তুই যা, আমি খুলে দিচ্ছি।’

দরজা খুলে দিতেই দেখি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। আমাকে দেখে মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, ‘আমাকে চিনতে পেরেছেন?’

‘জি, ঠিক–।’

‘বুঝতে পেরেছি, চিনতে পারেননি। সকালে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনাকে দেখেছি, আপনাদের বাসার একটা মানুষকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘আমার বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।’ ভদ্রলোকটির দিকে ভালো করে তাকালাম, ‘ও আপনি?’

‘জি, ট্রাফিক সার্জেন্ট।’

‘আসুন, ভেতরে আসুন।’ দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম আমি, ‘পুলিশের পোশাকে মানুষকে এক রকম দেখা যায়, সাধারণ পোশাকে আরেক রকম দেখা যায়।’

‘তাই?’ সোফায় বসতে বসতে সার্জেন্ট বললেন, ‘পোশাকটা আবরণ মাত্র, সব মানুষই প্রায় একই রকম দেখতে। আচ্ছা, আপনার বাবার এখন কী অবস্থা?’

'বাবাকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'বলেন কি!' চোখ দুটো বড় বড় করলেন তিনি, 'সকালের সেই ভদ্রমহিলা আপনার কে হন?'

'খালা।'

'উনি কি আছেন?'

'না, একটু বাইরে গেছেন।'

'ওনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

'খালা তো এখন নেই। আমাকে বলতে যদি অসুবিধা না হয়, বলুন। খালাকে আমি বলে দেব।'

'আপনাকে বলতে অসুবিধা নেই। সারা দিন আমাদের এতটা ব্যস্ত থাকতে হয় যে, অনেক কিছুই মনে থাকে না। দুপুরের খাওয়ার পর বিছানায় একটু শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আপনাদের কথা মনে পড়ল। তাই চলে এলাম।'

'ঠিকানাটা পেলেন কোথায়?'

'যে ক্যাবটা আপনাদের নিয়ে গিয়েছিল, ফেরত আসার সময় তার কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়েছি।'

'খালার কথায় আপনি মন-খারাপ করেছিলেন, না?'

'ঠিক মন-খারাপ নয়।' হাসার চেষ্টা করলেন সার্জেন্ট, 'কেমন যেন লেগেছিল।'

'খালার পক্ষ থেকে আমি স্যরি।'

'না না, স্যরি হওয়ার কিছু নেই। আমার মাও খুব রাগী মানুষ। আড়ালে কোনো কিছু বলে না, যা বলার মুখের সামনে বলে দেয়।'

'আপনার বাবা?'

'আমার বাবা মারা গেছেন।' সার্জেন্ট কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আপনাকে যদি একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না তো?'

'আমি কোনো কিছুতে কোনো কিছু মনে করি না।'

'আপনার বাবাকে তো আমি কখনো দেখিনি, তাই চিনতেও পারব না ওনাকে। চলুন না আমি আর আপনি মিলে ওনাকে একটু খুঁজি।'

মুগ্ধ চোখে আমি সার্জেন্টের দিকে তাকালাম। তিনিও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। একটু পর তিনি মাথাটা নিচু করে ফেলতেই আমি বললাম, 'ধন্যবাদ আপনাকে।'

'কিছু মনে করেননি তো আপনি?'

'এটা তো কিছু মনে করার মতো কথা না।'

'তবুও। বাঙালি মেয়েরা অপরিচিত কারো সঙ্গে বাইরে যাবে, এটা তো অকল্পনীয়।'

'আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি অনেকক্ষণ ধরেই বাইরে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু কার সঙ্গে যাব?' ভদ্রলোকটির দিকে তাকালাম আমি, 'আমার এক ছোট ভাই ছিল– ছোটন। ও যদি বেঁচে থাকত, তাহলে ও আমাকে নিয়ে সারা ঢাকা শহর বাবাকে খুঁজে বেড়াত।'

'কীভাবে মারা গেছেন তিনি?'

'রোড অ্যাকসিডেন্টে।'

ভেতরের ঘরে থেকে শিউলী বলল, 'আপা আপনার ফোন।'

ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি বসুন, আমি আসছি।'

ফোনটা ধরতেই জনা বললেন, 'খোকি, টুমি টোমার ড্যাডকে হারিয়ে ফেলেছে?'

'জি ম্যাম।'

'আমাকে বলোনি খেন টুমি এটা?'

'আমি কোনো কিছু ভাবতে পারছিলাম না ম্যাম।'

'টুমি কাঁদছ খেন খোকি?'

'ম্যাম, আমার বাবা হারিয়ে গেছেন, এখনো তাকে খুঁজে পাচ্ছি না, সকাল থেকে তিনি কী খেয়েছেন, কেমন আছেন, তাও জানি না। নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় লাগছে।'

'তুমি কিস্‌ছু চিন্তা খোরো না। মরিস টাকে খুঁজটে বের হয়েছে। টুমি কান্না খোরো না।' জনা একটু থেমে বললেন, 'আমি খি আসব?'

'না না, আসতে হবে না।'

'কেন আসতে হবে না, আমি টোমার ম্যাম না?'

ফোনটা রেখে দিলেন জনা। ড্রইংরুমে এসে দেখি সার্জেন্ট কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন মোবাইলে। আমাকে দেখেই ফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, 'কয়েকটা থানায় খোঁজ নিয়েছি, আপনার বাবা নেই। ভালো কথা, বিকেল হয়ে যাচ্ছে, এ সময় আপনার বাইরে না যাওয়াই ভালো। আমি রাতে একবার খোঁজ নেব আপনাদের।'

সার্জেন্ট চলে গেলেন। আমি বাবার ঘরে চলে এলাম। বিকেল হয়ে গেছে। প্রতিদিন বিকেলে আমার একটাই কাজ থাকত-- বাবার সঙ্গে গল্প করা। গল্প করতে করতে বাবা একেক দিন তার নিজের গল্প বলে ফেলতেন।

'বুঝলি মা, আমরা না অনেক গরিব ছিলাম।'

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'এখনকার চেয়েও গরিব?'

'হ্যাঁ, এখনকার চেয়েও। সজীব আর রাজীব মিলে তো দুতলা বিল্ডিং বানিয়েছে, আমার তো কোনো ভাই ছিল না। পাঁচ বোনের পর আমি হয়েছিলাম। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস জানিস, আমার জন্মের কিছুদিন

পরই বাবা মারা যান!'

'আপনার বয়স তখন কত ছিল?'

'শুনেছি দেড় বছর ছিল।' বাবা গলাটা করুণ করে বলেন, 'সংসারে অভাব, আমার দু বোনের মাত্র তখন বিয়ে হয়েছে। চার বছর না হতেই আমার চাচারা মিলে এতিমদের মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিল আমাকে।'

'আপনি মাদ্রাসায় পড়তেন?'

'আগে শোন। মাদ্রাসায় আসলে তেমন পড়াশোনা হয় না। হুজুররা তো তেমন পড়াতেনই না, সুযোগ পেলেই আমাদের দিয়ে গা টেপাতেন।'

'আপনার তখন খারাপ লাগত খুব, না?'

'খুব খারাপ লাগত।' বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'সে জন্যই তো মাঝে মাঝেই মাদ্রাসা থেকে পালাতাম আমি।'

'পালিয়ে কোথায় যেতেন?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম।'

'খেতেন কী সারা দিন?'

'কিছু না। খিদে লাগলেই টিউবওয়েলের পানি খেতাম।'

'মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে কদিন বাইরে থাকতেন?'

'কদিন না রে পাগলি, সকালে পালাতাম বিকেলেই চলে আসতাম।'

'বিকেলে ফিরে এলে কেউ কিছু বলত না?'

'কে কী বলবে, মাদ্রাসায় এত পোলাপান থাকত, কে কার খোঁজ রাখে।' বাবা আবার হাসেন, 'তবে একদিন ভীষণ পিটুনি খেয়েছিলাম আমি।'

'কেন?'

'সেদিন পালানোর সময় মাদ্রাসার দানবাক্সের তালা ভেঙে টাকা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি যে বাক্সের তালা ভেঙেছিলেন, সেটা কে দেখেছিল।'

'কেউ দেখে নাই। দুপুরের দিকে এক হুজুর এসে দেখেন দানবাক্সের তালা ভাঙা। কে ভেঙেছে– কেউ বলতে পারে না। শেষে মাদ্রাসার সব ছাত্রকে একসঙ্গে জড়ো করা হয়। সবাই জড়ো হয়, কেবল আমি ছাড়া। আমাকে মাদ্রাসায় না পেয়ে সন্দেহ করা হয় আমাকেই। বিকেলে মাদ্রাসায় ফিরলে আমাকে কী মার! দুটো বাঁশের বেত ভেঙে ফেলেছিল আমার পিঠের ওপর। পিঠে এখনো একটা দাগ আছে। দেখবি?'

বাবা তার পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেন। আমি লম্বা একটা কালচেটে দাগ দেখে চমকে উঠি। প্রচণ্ড কষ্ট হয় আমার। বাবার দাগটার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বাবাকে বলি, 'খুব ব্যথা পেয়েছিলেন, না?'

'খুব, দু ঘণ্টা তো তখন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।'

‘মাদ্রাসায় আপনি কত দিন পড়েছিলেন?’

‘সাত বছরের মতো পড়েছিলাম।’

‘মাত্র সাত বছর কেন?’

‘সে এক বিরাট ইতিহাস রে মা।’

‘ইতিহাসটা কি আমাকে বলা যাবে?’

‘লজ্জার ব্যাপার রে মা।’ বাবার মুখটা লাল হয়ে যায়, ‘এক রাতে মাদ্রাসায় এক চ্যাংড়া হুজুর আমার পরনের পাজামা ধরে টানাটানি শুরু করে। প্রথমে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। হঠাৎ খেয়াল হলো, হুজুরের মতলব ভালো না, খারাপ। আমি চট করে হুজুরের হাতে জোরছে একটা কামড় দিয়ে সে রাতেই পালিয়ে আসি মাদ্রাসা থেকে। কিন্তু মাদ্রাসার বাইরে এসে মনে হলো, আমি এখন কোথায় যাব? প্রথমেই বড় আপার কথা মনে হলো। ৯ মাইল হেঁটে আপার বাসায় গিয়ে সব খুলে বললাম দুলাভাইকে। দুলাভাই ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন সেদিন, পারলে তখন এসে চ্যাংড়া হুজুরটাকে খুন করে ফেলেন। আপা অনেক বলে-কয়ে ঠেকিয়ে রাখে। শেষে দুলাভাই আমাকে বলেন, তোর আর কোথাও যেতে হবে না, তুই এখানে থেকেই এখন লেখাপড়া শিখবি।’

‘তার পর থেকে আপনি সেখানেই রয়ে গেলেন?’

‘হ্যাঁ, সেখান থেকে একে একে বিএ পাস করলাম। তারপর একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরিও জোগাড় করে দিলেন দুলাভাই। আমি কিন্তু চাকরি করতে করতে এমএটাও কমপ্লিট করেছিলাম।’

‘আপনি তো সারা জীবন একটা ফার্মেই চাকরি করেছেন বাবা, না?’

‘হ্যাঁ। প্রথম থেকে কেন যেন ফার্মটার প্রতি মায়া জন্মে গিয়েছিল, তা ছাড়া মালিকও ছিলেন ভীষণ ভালো। আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন।’

‘তিনি তো আপনাকে অনেক কিছু দিতেও চেয়েছিলেন।’

‘কিন্তু আমি নিইনি, বড় লজ্জা লাগত।’ বাবা মুখটা কঠিন করে ফেলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই কারো কাছ থেকে কিছু নিতে ভীষণ লজ্জা লাগত আমার। তোদের তো বলেছি, এই যে জায়গাটায় আমরা এখন বাস করছি, সেটা আমার দাদা বাবাকে দিয়েছিলেন, বাবা মারা যাওয়ার এক বছর আগে সেটা আমাকে লিখে দিয়ে গেছেন। তখন তো আমি ছোট ছিলাম, কিছু বুঝতাম না। বুঝলে হয়তো এ জায়গাটাও নিতাম না। নিজের টাকা-পয়সা দিয়ে নিজের জিনিস করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে।’ বাবা আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলেন, ‘বুঝলি, সে আনন্দটা আলাদা আনন্দ।’

বড় ভাবি দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ‘নূপুর, অন্তুকে দেখেছ?’

বাবার বিছানা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘না।’

‘অন্তুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘সারা বাসা দেখেছ?’

‘দেখেছি, কোথাও নেই।’

‘বাইরে কোথাও যায়নি তো?’

‘ও কখনো না-বলে বাইরে যায় না।’

‘বাসার সামনের মাঠটাতে দেখেছ?’

‘দেখেছি, নেই।’

‘ভাইয়া কই?’

‘কোথায় কোথায় যেন ফোন করছে।’

‘ছোট ভাইয়া?’

‘ওরা দুজন তো এখনো ঘুমাচ্ছে।’

কলবেলটা বেজে উঠল। ভাবি দৌড়ে চলে গেল দরজা খুলতে। পেছনে পেছনে আমিও গেলাম। ভাবি দরজা খুলে দিল। খালা গম্ভীর-মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। ভাবির মুখের দিকে তাকিয়ে খালা আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘কী হয়েছে?’

ভাবি কিছু বলার আগেই পেছন থেকে ভাইয়া অস্থিরভাবে বলল, ‘অন্তুকে খুঁজে পাচ্ছি না।’

‘এত অস্থির হয়ে যাচ্ছিস কেন এতে?’

ভাইয়া কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, ‘একটা মানুষকে খুঁজে পাচ্ছি না, এতে অস্থির হব না?’

খালা একটু এগিয়ে এসে ভাইয়ার একেবারে সামনে দাঁড়ালেন। তারপর খুব শান্ত স্বরে বললেন, ‘সকাল থেকে তোর বাবাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’

দু চোখ নামিয়ে ফেলে ভাইয়া। বিকেলের ম্লান আলো এসেছে ঘরে, সে আলোতে ভাইয়ার মুখটা আরো ম্লান দেখায়।

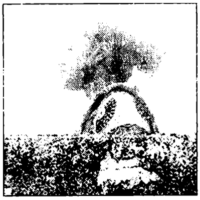

কখনো সহজে মন-খারাপ হয় না আমার। যখন হয়, প্রচণ্ড রকমের হয়। কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! মন-খারাপ হলেই কেমন করে যেন টের পেয়ে যেত ছোটন। তারপর ঘরে এসে প্রথমে গভীর চোখে তাকাত আমার দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুখটা হাসি হাসি করে পাশে এসে বসত। একসময় আলতো করে আমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলত, 'আপু, বল তো, দুই আর দুইয়ে কত হয়?'

কিছুটা রাগী চোখে ওর দিকে তাকাতাম আমি।

মুখটা আরো হাসি হাসি করত ও, 'আপু, বল না।'

আমি আরো রেগে গিয়ে বলতাম, 'এটা একটা প্রশ্ন হলো?'

'প্রশ্ন হলো না!' ছোটন ওর কপালটা কুঁচকে বলত, 'দুই আর দুইয়ে কত হয়, এটা প্রশ্ন না?'

ছোটনের একটা কান টেনে ধরে আমি বলতাম, 'দুই আর দুইয়ে কত হয়, তুই জানিস না?'

'জানি তো।'

'তাহলে?' আমি ওর হাত থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'এ পর্যন্ত তুই আমাকে কতবার এ প্রশ্নটা করেছিস?'

'এবার তুই বল তো, এ কদিনে তুই কতবার মন-খারাপ করেছিস?'

'মন-খারাপ হলে মন-খারাপ করব না?'

'না।' ছোটন আমার কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে বলে, 'দুই আর দুই মিলে যেমন চার হয়, মন আর মাথা থাকলে তেমন মন-খারাপ হয়।'

'এটা একটা কথা হলো?'

'কথা হলো না?' ছোটন আমার সামনে পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলে, 'মন থাকলেই ভাবনা হয়, ভাবনা হলেই মাথাব্যথা হয়, আর মাথাব্যথা হলেই মন-খারাপ হয়। আচ্ছা আপু, তুই কি জানিস, মানুষের প্রতিটা মুহূর্ত একেকটা অভিজ্ঞতা?'

'জানি।'

'মন-খারাপ হওয়ার ব্যাপারটাও একটা অভিজ্ঞতা।'

ছোটন প্রতিবারই প্রায় একই ধরনের কথা বলে। তারপর ওর সেসব কথা শুনে মন ভালো হয়ে যায় আমার। হাসি হাসি মুখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন অনেকক্ষণ। আমি আমার জল-টলমল চোখে ওকে বলি, 'তোর মতো ভাই পৃথিবীতে আর কয়টা আছে, বল তো?'

শব্দ করে হেসে উঠে ও বলত, 'তোর মতো বোনই কয়টা আছে, বল তো?'

কিন্তু স্বার্থপরের মতো ব্যাপারটা হচ্ছে, ওর যখন মন-খারাপ হতো, আমি তখন ওর মনটা ভালো করতে পারতাম না। এটা আমার ব্যর্থতা। তবে আমি প্রচণ্ড চেষ্টা করতাম।

সন্ধ্যার অনেক পরে ও একদিন বুয়েট থেকে বাসায় এলো। মুখটা কেমন যেন কালো হয়েছিল ওর। ছোটন ওর ঘরে ঢুকেই একদম চুপচাপ, যা ওকে একদম মানায় না। আর ও এ রকম চুপচাপ থাকার ছেলেও না। সুতরাং ওর মন-খারাপ। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরে ওর জন্য ওর মতো করে চা বানালাম– দুধ বেশি, চিনিও বেশি। চা নিয়ে ওর ঘরে ঢুকেই দেখি, বিছানার ওপর মাথা নিচু করে বসে আছে ও। কাছে গিয়ে ওর পাশে বসে চা ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'ছোটন, তুই বলিস না মানুষের প্রতিটা মুহূর্ত একেকটা অভিজ্ঞতা, মন-খারাপ হওয়ার ব্যাপারটাও একটা অভিজ্ঞতা।'

'সব অভিজ্ঞতা ভালো না আপু।' ছোটন মাথা তুলে আমার দিকে তাকায়।

'তোর কি খুব বেশি মন-খারাপ?'

মাথাটা উঁচু করল ছোটন।

'মন-খারাপের ব্যাপারটা কি আমাকে বলা যাবে?'

কোনো কথা বলে না ছোটন।

'বলা না গেলে বলার দরকার নাই।'

'আসলে ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না আপু।'

'শরীর কিছু হয়েছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'তুমি তো জানো– ঢাকা ভার্সিটিতে আমার বেশ কজন বান্ধবী আছে।'

'ওই যে লুবনা, সোহানা, মিতু, জলি?'

'ওরা সবাই ঢাকার বাইরে থেকে এসে এখানে পড়ছে। তুমি কি জানো ওরা একেকজন কী করে? ওরা যে হলে থাকে সে হলের মেয়েদের ভ্রূ পাক করে দেয় ওরা, এতে মাসে বেশ কিছু টাকা আয় করতে পারে ওরা। কেউ জামা সেলাই করে, কেউ চুলও কেটে দেয়। এসব খারাপ কিছু না। কিন্তু আজ একটা কথা শুনে বুকের ভেতর একেবারে মুচড়ে উঠেছে রে আপু।'

'খুব খারাপ কথা!'

'খুবই।' ছোটন বিষণ্ন ভেজা গলায় বলে, 'সোহানা নাকি টাকার বিনিময়ে প্রায় দিনই বিভিন্ন পার্টিতে যোগ দেয়, কোনো কোনো রাতে নাকি হলেও ফেরে না।'

'বলিস কি!'

'আজ বিকেলে সোহানার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

'তুই কিছু বলেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'ও কী বলল?'

চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে ওর, 'সোহানা হাসতে হাসতে বলে, ছোটন, আমি একেবারে কৃষক পরিবারের একটা মেয়ে। প্রতি মাসে ঢাকায় পড়তে হলে একটা মেয়ের অন্তত দু হাজার টাকা দরকার। আবার বাবার এ টাকাটা দেওয়ার সামর্থ্য নেই।'

'তাই বলে–।'

'পৃথিবীতে মানুষের এই যে এত ব্যস্ততা, তা কিসের জন্য, জানো? ক্ষুধা নিবারণের জন্য। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর আমি বেশ কয়েকবার না-খেয়ে দিন কাটিয়েছি। একবার পুরো আড়াই দিন কেবল পানি খেয়েছিলাম।'

'তুমি তো আমাকে কিছু বলোনি।'

'সব কথা কি বলা যায় ছোটন?'

'তার পরও।'

'আমি তোমাকে জানি ছোটন, তার পরও তোমাকে বলিনি। মানুষের করুণা পাওয়া যে কত লজ্জার, যদি জানতে! প্রচণ্ড অভাবের সময় কারো কাছে যে টাকা ধার চাইনি, তা না। চেয়েছি, কিন্তু পাইনি। হতাশা আর আতঙ্কে যখন দিন কাটছিল, তখন হলের এক আপা আমাকে এ পথটা দেখিয়ে দেন। ছোটন, তুমি কি জানো– ঢাকা শহরে পড়তে আসা অনেক মেয়ে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কত কী করে?'

'আপু-।' ছোটন আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'সোহানা হাসছে, কিন্তু ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। একসময় ও কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, নিয়তি বোঝো ছোটন? এ আমার নিয়তি।'

প্রচণ্ড মন-খারাপ হয়ে আছে এখন। এ সময় অন্তু থাকলে ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অন্তুটা যে আজ কোথায় গেল? অন্তুর মন-খারাপ হলে মাঝে মাঝে বলত, 'ফুপুমণি, তুমি দেখো, আমি একদিন বাসা থেকে পালাব।'

খুব আতঙ্কিত হয়ে আমি তখন বলতাম, 'কেন!'

'কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার।'

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বলতাম, 'কী ভালো লাগে না তোর– লেখাপাড়া, স্কুল, না বাসা?'

'বললাম না, কোনো কিছুই ভালো লাগে না।'

মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে ওকে বলি, 'আইসক্রিম খাবি?'

'আইসক্রিমও ভালো লাগে না।'

'চুইংগাম?'

'চুইংগামও না।'

'তাহলে চকলেট মিল্ক?'

'কোনো কিছুই না।'

'তোর আজ কী হয়েছে, বল তো?'

মুখটা গম্ভীর করে অন্তু বলে, 'কিছু না।'

'তোকে একটা কথা বলি, বাসা থেকে পালায় কারা, জানিস? দুষ্টুরা।'

'দাদুও তো বাসা থেকে পালায়।'

'তোর দাদু তো বড় মানুষ।'

'আমিও বড় মানুষ।'

আজ মনে হচ্ছে, অন্তু সত্যি সত্যি বড় হয়ে গেছে। ওর কোনো কারণে মন-খারাপ, বাসা থেকে পালিয়েছে তাই আজ।

খালা ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই বিকেলবেলা কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাসায় ভালো লাগছে না খালা।'

'কোথায় যাবি?'

'জানি না।'

'একা একা কোথায় ঘুরবি?'

'আমি জানি না খালা।'

'আমি যাব তোর সঙ্গে?'

'না, তুমি কিছুক্ষণ আগেই তো বাইরে থেকে এলে।'

'ড্রাইভার আছে, তোর খালুর গাড়িটা নিয়ে যাবি?'

'না থাক।'

বাসা থেকে বের হয়েই থমকে দাঁড়ালাম আমি। কোথায় যাব আমি, এ শহরের কতটুকুই বা আমি চিনি। ছোটনের সঙ্গে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর বাসা থেকে বের হতাম। কোনো কারণ থাকত না। হঠাৎ হঠাৎ ছোটন এসে বলত, 'আপু, সুন্দর দেখে একটা ড্রেস পর তো।'

আমি অবাক হয়ে বলতাম, 'কেন?'

'আহা, পরই না!'

'আগে বলবি তো, কেন?'

'বাইরে যাব।'

'এই রাত করে বাইরে?'

'রাতের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে রে আপু, ঘরে বসে থাকলে সে সৌন্দর্য বোঝা যায় না।'

'তোর কি কোনো কারণে মন-খারাপ?'

'না।' ছোটন আমার একটা হাত ধরে বিছানা থেকে টেনে তুলে বলত, 'আজ আমরা অনেকক্ষণ বাইরে হাঁটব, তারপর কাবাব আর পরাটা খাব।'

সংসদ ভবনের পাশ দিয়ে আমরা আনমনে হাঁটতাম। আমি চুপচাপ থাকতাম আর ছোটন কথা বলত। বেশির ভাগ সময় ও শর্মীর কথাই বলত। কখনো কখনো তুপা, সোহানা, জলিদের কথাও বলত।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তিনজন পুলিশ এসে সামনে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে একজন পুলিশ বলল, 'আপনাদের সম্পর্ক?'

ছোটন হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার কী মনে হয়?'

'আমার তো অনেক কিছুই মনে হয়, আপনি বলেন আপনাদের সম্পর্ক কী?'

'ভাই-বোন আমরা।'

পাশ থেকে আরেকজন পুলিশ বলল, 'ভাই-বোন কখনো এভাবে হাঁটে?'

'কীভাবে হেঁটেছি আমরা?'

'এই যে, হাত-ধরাধরি করে।'

'আপনার কি মনে হয় কেবল বউয়ের সঙ্গেই মানুষ হাত-ধরাধরি করে হাঁটে, আর কারো সঙ্গে হাঁটে না?'

'আপনার পরিচয়?'

ছোটন কিছুটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'আমি মানুষ।'

'আপনি মানুষ তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তাহলে প্রশ্ন করছেন কেন?'

'আমরা এ এলাকায় ডিউটিতে আছি, এ এলাকার দেখভাল করার দায়িত্ব এখন আমাদের, আমরা তাই প্রশ্ন করতেই পারি।'

'ও, আচ্ছা। তা এবার বলেন, আমার পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোন আত্মীয়ের পরিচয় দিলে ভালো হয়?'

'কতজন আত্মীয় আপনার?'

'অনেক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার কে হয় এটা বলব, না নাক-কাটা বিল্লু আমার কী হয় সেটা বলব?'

তৃতীয় পুলিশটি চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'নাক-কাটা বিল্লু আপনার আত্মীয় হয় নাকি?'

'তা আপনাকে এতক্ষণ কী বললাম!'

'ঠিক আছে, আপনারা হাঁটাহাঁটি করুন। আমরা আশপাশেই আছি, প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।'

বাসায় বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সত্যি সত্যি কোথাও যাওয়ার নেই আমার। শর্মী যদি আজ দেশে থাকত, তাহলে ওর কাছে যাওয়া যেত। কিন্তু ও তো দেশে নেই। ছোটনের মৃত্যুর কয়েক দিন পরই দেশের বাইরে চলে যায় ও। ওর বাবা-মা দেশের বাইরেই থাকতেন। ও-ই কেবল ওর দাদুর বাসায় থেকে লেখাপড়া করত।

মাঝে মাঝে শর্মী ফোন করে। অনেকক্ষণ কথা বলে আমার সঙ্গে। আমি টের পাই, ও কথা বলে আর কাঁদে। একসময় ও ফোঁত ফোঁত করে নাক টেনে বলে, 'আপু, ছোটন এভাবে মারা না গেলেই পারত!'

আমি বলি, 'ওর ভাগ্যে এটাই ছিল যে।'

'ভাগ্য না ছাই! কেন যে মানুষকে এত কষ্ট দেয় আল্লাহ্!'

কিছুই বলি না আমি। আমি কি জানি মানুষের এত কষ্ট কেন? কেন এত অবিরাম দুঃখ?

বাসার ভেতর ফিরে আসতে নিয়েই মনে হলো, সোহানার কাছে গেলে কেমন হয়। সোহানাকে কখনো দেখিনি আমি, তবে ও কোন হলে থাকে সেটা জানি। আর ওর মতো একটা মেয়েকে খুঁজে বের করা কোনো কঠিন কিছু হবে না। ওর হলে গিয়ে খোঁজ নিলেই পাওয়া যাবে ওকে। তারপর? সোহানা আমার সামনে এসে বলবে, 'আপনাকে তো চিনলাম না!'

আমি বলব, 'কিন্তু আমি তোমাকে চিনি।'

'কীভাবে?'

'সেটা তো বলব না।'

'আপনি কি আমাকে কিছু বলতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'আজ সারাটা রাত আমি তোমার সঙ্গে কাটাব।'

'কেন?'

'তোমার প্রতিটা রাত কেমন কাটে, খুব জানতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'আচ্ছা, আপনি কে, বলুন তো?'

'আমি কেউ না।' বলেই আমি চলে আসব সোহানার সামনে থেকে। কিছুটা এসেই আমি আবার ফিরে তাকাব ওর দিকে। দেখব, অবাক হয়ে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার আবার ওর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে, ওর হাত ধরে কিছু বলতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু কিছুই বলা হবে না আমার।

আমার বলা হবে না– অস্তিত্বের সংকটে মানুষ একদিন তার সবকিছু হারিয়ে ফেলে, কোনো অবলম্বন থাকে না আর। এক অবলম্বনহীন মানুষ হয়ে তুমি কীভাবে বেঁচে আছ?'

জানি কথাটা শুনে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত সোহানা। আমি ওর স্নিগ্ধতা-জড়ানো মুখটায় হাত দিয়ে তখন বলতাম, 'ভালো থেকো বোন, যেভাবে ভালো থাকা যায়।'

বাসায় ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কলবেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দিলাম আমি। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আমাকে দেখে বলল, 'আমি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে এসেছি। নূপুর নামে একজনের একটা চিঠি আছে।'

কুরিয়ার সার্ভিসের একটা কাগজে সই করে চিঠিটা নিলাম আমি। দ্রুত ঘরে এসে খুলেই দেখি পল্লব লিখেছে চিঠিটা।

প্রিয় নূপুর

অবশেষে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হয় বাবাকে খুন করব, নাহয় মাকে খুন করব। মা ইদানীং পাগলের মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে পাগলের মতো অসংলগ্ন কথা বলে, কাঁদে, আবার শব্দ করে হাসে। বাবার মদ খাওয়ার মাত্রা বেড়ে গেছে। বাবা দিনের বেলায়ও এখন বাসায় বসে মদ খায়।

আচ্ছা, আপনি কি বলে দেবেন, আমার এখন কাকে খুন করা উচিত?

শীত লাগছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, নারকেল পাতাগুলো ঝিরিঝিরি কাঁপছে। সুখী সুখী পাতাগুলোকে প্রচণ্ড ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

সন্ধ্যা হওয়ার আগে বেশ ছটফট করেন বাবা, প্রতিদিন। তখন আমার ঘরে এসে খুব নরম স্বরে বলেন, 'মা রে, তোর কি একটু সময় হবে?'

'হবে।' বাবা কেন সময় চাইছেন এটা আমি জানি। তবু হাসতে হাসতে আমি বলি, 'কেন?'

বাবা প্রতিদিনের মতো জবাব দেন, 'এ সময়টাতে কেন যেন দম আটকে আসে। তোকে নিয়ে একটু ছাদে যাব।'

ভাইয়ারা বিল্ডিং করার পর থেকেই বাবা এ রকম করেন। তার আগে আমাদের টিনের ঘর ছিল। চারদিকে জানালা-ঘেরা আমাদের ঘরটাতে সারা দিন বাতাস খেলা করত। আর এত আলো আসত আমাদের ঘরে, কেমন যেন সব সময় ঝকঝক করত ঘরটা।

টিনের ঘরটা থাকার সময় বাবা দুটো সময় শিশুর মতো আচরণ করতেন। এক. বৃষ্টি হলে, দুই. শীতের রাতে চালের ওপর শিশির পড়লে।

বৃষ্টি শুরু হলেই বাবা আমাদের সবাইকে ডেকে একসঙ্গে জড়ো করতেন। তারপর বলতেন, 'সবাই মনোযোগ দিয়ে কান দুটো পাত তো দেখি?'

আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে কান পাততাম।

'কিছু শোনা যায়?'

মা বলত, 'হ্যাঁ, বৃষ্টির শব্দ।'

'আর কিছু?'

'আর কী শোনা যাবে!'

'আরো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো, দেখবে আরো কিছু শোনা যাচ্ছে।'

মা অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর বলত, 'না, আর কিছু শোনা যায় না।'

বাবা তখন আমাকে বলতেন, 'মা নূপুর, তুই বল তো আর কিছু শোনা যায় কি না?'

'হ্যাঁ, এক ধরনের ছন্দ টের পাওয়া যায় বাবা।'

বাবা আনন্দে কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলতেন, 'ঠিক ধরেছিস। বৃষ্টির শব্দে এক ধরনের একটা ছন্দ আছে, অপূর্ব সে ছন্দ।' বাবা উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'মা, এবার বল তো, এই ছন্দটা আসলে কী?'

'কী বাবা?'

'আহ্, একটু ভেবে বল না!'

বেশ কিছুক্ষণ ভেবেও আমি কিছু বলতে পারি না। কিছুটা অপরাধী চোখে বাবার দিকে তাকাই। বাবা তখন প্রশান্তির হাসি হেসে বলেন, 'এই ছন্দটা আসলে প্রকৃতির গান।'

প্রকৃতির সে গান শুনতে শুনতে আমরা অনেক দিন চুপচাপ বসে থাকতাম। বাবা কোনো কোনো দিন বলতেন, 'সজীবের মা, আজ একটু খিচুড়ি রাঁধো না। বহুদিন গরুর মাংস দিয়ে খিচুড়ি খাই না।'

বিব্রত চোখে মা তখন বাবার দিকে তাকাত। আমি বুঝতাম, মা কেন এভাবে বাবার দিকে তাকিয়েছে। অভাবের সংসার, যেখানে প্রতিদিন সাধারণ খাবার খেয়ে দিন চলে আমাদের, সেখানে গরুর মাংস পাবে কোথায়? ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই আমি বাবার একটা হাত চেপে ধরে বলতাম, 'বাবা, ব্যাপারটা আপনি ভুলে গেছেন?'

বাবা অবাক হয়ে বলতেন, 'কোন ব্যাপারটা?'

'ওই যে, ডাক্তারের ব্যাপারটা।'

'ডাক্তারের ব্যাপার–।'

বাবা কথাটা মনে করার আগেই আমি বলি, 'ওই যে আপনার বাঁ হাত এবং বুকে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। ডাক্তার আপনাকে একদম গরুর মাংস ছুঁতে নিষেধ করেছেন।'

'হ্যাঁ, তাই তো!' বাবার চেহারাটা অপরাধী অপরাধী হয়ে যায়। আমি বাবার বাঁ হাতটা টিপে দিতে দিতে বলি, 'তার চেয়ে আমরা বরং আজ সবজি-খিচুড়ি খাই। একেবারে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার।'

মা আমার কথাটা শুনে সতেজ চোখে তাকায় আর বাবা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'খুব ভালো, খুব ভালো।'

শীতের দিনের মাঝরাতে প্রায়ই বাবা আমাদের সবাইকে ডেকে তুলতেন ঘুম থেকে। মা বিরক্ত হয়ে বলত, 'এত রাতে আবার কী?'

বাবা কিছুটা অনুনয় করে বলতেন, 'আগে আসই না আমার সঙ্গে।'

বাবার সঙ্গে ঘরের মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা মাদুর পেতে বসতাম আমরা। তারপর বাবার কথামতো চুপচাপ কান পেতে রাখতাম। একটু পর বাবা বলতেন, 'শিশির পড়ছে, শুনতে পাচ্ছ?'

মা রেগে তখন বলত, 'এটা তো প্রতি রাতেই শুনি।'

বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, 'কই প্রতি রাতে শোনো তুমি? রাতে যখন শিশির পড়ে তুমি তখন জেগে থাকো নাকি?'

'জেগে না থাকলেও মাঝে মাঝে শুনতে পাই।'

'আচ্ছা, এবার বলো তো, শিশিরকে কী বলে?'

'শিশিরকে আবার কী বলবে, শিশির তো শিশিরই।'

'না।' বাবা আরো মুখ উজ্জ্বল করে বলেন, 'শিশির হচ্ছে প্রকৃতির কান্না।'

'প্রকৃতি আবার কাঁদে নাকি?'

'কাঁদে না!'

'কেন কাঁদবে?'

বাবা মুখটা ম্লান করে বলেন, 'প্রতিদিন এই যে এত অন্যায়-অবিচার চলে পৃথিবীতে, প্রকৃতি এ জন্য কাঁদে, নীরবে কাঁদে।'

আমাদের একটা পিচ্চি কাজের মেয়ে ছিল– চম্পা। কথাটা শুনে চম্পা বলে, 'খালুজান, টিনের চালে আসলে যে আওয়াজ হয়, সেইটা নাকি ভূতের মুতের আওয়াজ?'

বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'পৃথিবীতে ভূত আছে নাকি রে পাগলি। শোন, ভূতের কথা যখন উঠলই তাহলে তোদের একটা গল্প বলি। আমার ছোটবেলার গল্প। গরমের ছুটি দিয়েছিল মাদ্রাসা। বাড়িতে চলে এলাম। আমের দিন, একটু বাতাস হলেই টুপ টুপ করে আম পড়ত। সন্ধ্যার দিকে বাহির-বাড়িতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। বাহির-বাড়িতে আমাদের একটা আমগাছ ছিল– কাঁচামিঠা আমগাছ। যা মিষ্টি ছিল আমগুলো, নারকেলের মতো লাগত! তো হয়েছে কি শোন, আমি হঠাৎ দেখি, আমাদের কাজের ছেলে ছদরুল আমগাছ থেকে নামছে। আমি তো অবাক। ছদরুল গাছে উঠল কখন? ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ছদরুলের লুঙ্গির কোছে অনেকগুলো আম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে ছদরুল, তুই কখন গাছে উঠলি?'

কোনো কথা বলল না ছদরুল, শুধু হাসল।

আমি আবার ওকে জিজ্ঞাসা করি, 'গাছে উঠলি কখন, বল না।'

ছদরুল এবারও কোনো কথা বলল না।

রেগে গিয়ে ওকে ধরতে যাই আমি। সঙ্গে সঙ্গে ও দৌড়াতে থাকে। পেছন পেছন আমিও দৌড়াতে থাকি। বড় একটা জঙ্গলের মতো জায়গা ছিল আমাদের গ্রামে। বেশ কিছুদূর দৌড়ে যাওয়ার পর দেখি, ছদরুল সেই জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো– ছদরুল এই সন্ধ্যায় জঙ্গলের ভেতর যাচ্ছে কেন, আর আমি বা যাচ্ছি কেন? চট করে চারপাশে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুটা চিৎকার করে আমি দৌড়ে বাড়িতে ঢুকেই দেখি, ছদরুল বারান্দায় বসে হারিকেনের চিমনি মুছছে আর আগুন জ্বালাচ্ছে।

আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর ওর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললাম, 'তুই এতক্ষণ কই ছিলি?'

'কই ছিলাম, এখানেই তো!' ছদরুল বলে।

'কিছুক্ষণ আগে তুই কাঁচামিঠা আমগাছে উঠেছিলি না?'

'না তো!' ছদরুল মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

'গাছে উঠে তুই আম পারিসনি?'

'না।'

'কিছুক্ষণ আগে যে তোকে আমগাছ থেকে নামতে দেখলাম?'

মা ভেতরঘর থেকে এ সময় এগিয়ে এসে বলে, 'কী হয়েছে?'

মায়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'একটু আগে ছদরুল আমগাছে উঠেছিল মা ।'

মা রেগে গিয়ে বলে, 'একটু আগে ও আমগাছে উঠতে যাবে কেন! ও তো অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় বসে কাজ করছে।'

'কিন্তু আমি যে দেখলাম, ও কাঁচামিঠা আমগাছ থেকে অনেকগুলো আম পেড়ে নামল! তারপর আমি কিছু বলতেই দৌড়ে দৌড়ে খাঁ-বাড়ির জঙ্গলের ভেতর ঢুকল।'

মা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, 'বলিস কি! তারপর?'

'আমিও ওর পেছন পেছন জঙ্গলের ভেতর ঢুকছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কী মনে করে ঢুকলাম না। বাড়িতে এসেই দেখি ও এখানে বসে কাজ করছে।'

মা সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরল আমাকে। তারপর কী একটা দোয়া পড়ে ফুঁ দিতে দিতে ঘরে নিয়ে গেল। সেদিন বিকেলের পর আমাকে আর ঘরের বাইরে যেতে দেয়নি মা।

বাবা তার ছোটবেলার গল্প বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে যেতেন। টিনের ঘরটা ভেঙে ফেলার পর অনেক দিন চুপ হয়ে ছিলেন বাবা। ভাইয়ারা একতলা কমপ্লিট করে, বাবার অস্থিরতা বেড়ে যায়। দোতলা কমপ্লিট করার পর বাবা একদিন বেশ ঘেমে গিয়ে বললেন, 'সম্ভবত আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। কেমন যেন ইদানীং দম আটকে আসে আমার।'

মা বেঁচে থাকার সময় বাবা প্রতিদিন তাই সন্ধ্যার আগে মাকে নিয়ে ছাদে যেতেন। এখন যাই আমি। ছাদে উঠেই বাবা একটা কাঠের চেয়ারে বসেন, তারপর শুরু করে দেন গল্প। বেশির ভাগই তার অফিসের গল্প।

'জানিস, আমার চাকরিজীবনে সবচেয়ে বড় সার্থকতা কী?'

আমি উৎসাহী হয়ে বলি, 'কী বাবা?'

'একটা ছেলেকে চাকরি দেওয়া।' বাবা চেয়ারটাতে ঠেস দিয়ে বসে বেশ আয়েশ করে বলেন, 'একদিন দুপুরে এক ছেলে অফিসে ঢুকে আমার টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হলো। চোখ দুটো ভেজা ভেজা। কাজ করা বাদ দিয়ে আমি ছেলেটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে

বললাম, কিছু বলবেন? ছেলেটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, জরুরি একটা কথা বলব আমি।'

আমি বললাম, 'বলুন।'

'স্যার, এ জায়গাটাতে বলতে একটু অসুবিধা আছে, আপনি যদি একটু বাইরে আসতেন।'

অফিসের বাইরে এসে সামনের একটা চায়ের দোকানে বসলাম আমরা। দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ছেলেটাকে বললাম, 'বলুন।'

ছেলেটা কথা বলতে নিয়েই কেমন যেন কাঁপছিল। আমি তার একটা হাত ধরে বললাম, 'কী হয়েছে আপনার?'

বেশ লাজুক মুখে ছেলেটা বলল, 'কিছু না।'

আমি একটু ধমক দিয়ে বললাম, 'তাহলে এভাবে কাঁপছেন কেন?'

মাথাটা নিচু করে ছেলেটি বলল, 'গত রাত থেকে কিছু খাইনি তো!'

সঙ্গে সঙ্গে দুটো কলা আর একটা পাউরুটি দিতে বললাম তাকে। চায়ের দোকান, এর চেয়ে ভালো কিছু ছিল না দোকানে। কলা আর পাউরুটি খেতে খেতে ছেলেটি বলল, 'স্যার, আমার তিনটা বোন আর একটা ছোট ভাই আছে, কিন্তু ভাইটা পাগল। আমার বাবার একটা ছোট্ট মুদিদোকান আছে। কিন্তু বাবা প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকেন, তখন মা বসে দোকানে। গত বছর আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি। কিন্তু এক বছর ধরে আমি একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি, কোথাও পাইনি। অথচ খুব তাড়াতাড়ি আমার একটা চাকরি দরকার। বাবার হার্নিয়ার অপারেশন করাতে হবে, বড় বোনটার বিয়ে দিতে হবে, পাগল ভাইটার মাঝে মাঝে চিকিৎসা করাতে হয়, ছোট দু বোনের লেখাপড়ার খরচ। স্যার–।' ছেলেটা জলভরা চোখেই আমার দিকে তাকাল, 'আর যদি সাত দিনের মধ্যে একটা চাকরি না পাই, তাহলে আত্মহত্যা করব আমি।'

বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল আমার। আমি ছেলেটার চোখের দিকে তাকালাম। সরল চাহনি।

'আচ্ছা, আপনি ঢাকায় কোথায় উঠেছেন?' ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমাদের গ্রামের এক লোক থাকেন মেসে, দুদিন আগে তার ওখানে উঠেছি।'

'ঢাকায় আপনার আর কেউ নেই?'

'না।'

কথাটা বলেই ছেলেটা আমার হাত চেপে ধরে ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'স্যার, আমি আপনার ছেলের মতো, আপনি আমাকে একটু দয়া করুন।'

ছেলেটার কান্না দেখতে দেখতে আমার কান্না এসে গেল। কিন্তু কী মুশকিল! আমি চাকরি দেব কোথা থেকে! ছেলেটা কোনোক্রমেই আমার হাত ছাড়ে না।

শেষে আমি বললাম, 'আপনি এখানে বসুন, আমি কিছুক্ষণ পর অফিস থেকে আবার আসছি।'

অফিসে এসেই বড়সাহেবের রুমে ঢুকলাম আমি। বড়সাহেব খুব স্নেহ করতেন আমাকে। হেসে হেসে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার বশির সাহেব?'

'স্যার, একটা আবদার নিয়ে এসেছি আমি।'

'আবদার!' ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যান বড়সাহেব, 'কিসের আবদার বশির সাহেব? আপনি প্রায় পঁচিশ বছর চাকরি করছেন আমার অফিসে, কিন্তু আজই প্রথম একটা আবদার নিয়ে এসেছেন আপনি। বলুন বলুন, আমি খুব আনন্দ বোধ করছি।'

'একটা চাকরি দিতে হবে স্যার।'

'কাকে?'

'একটা ছেলেকে।'

'আপনার ছেলে?'

'না স্যার।'

'তাহলে?'

'ছেলেটাকে চিনি না। কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার।'

'এ রকম একটা অপরিচিত ছেলেকে চাকরি দিতে চাইছেন, ব্যাপারটা কি ভালো হবে? কেমন না কেমন ছেলে।'

'সম্ভবত ভালো ছেলে স্যার।'

'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'ছেলেটার চোখ দেখে।'

বড়সাহেব কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'কী পড়েছে ছেলেটা?'

'মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে।'

'কোন সাবজেক্ট?'

'সেটা শোনা হয়নি স্যার।'

'ঠিক আছে, অফিসের কোথাও বসিয়ে দিন। বেতন পরে ঠিক করা যাবে।'

'থ্যাংকু স্যার।'

বড়সাহেবের রুম থেকে বের হতে নিতেই স্যার আমাকে ডাকলেন। ঘুরে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'বশির সাহেব, টেবিলে বসে মাঝে মাঝে আপনি কিছু কথা বলেন, আপনার কলিগরা তা শোনে, আমার কানেও আসে। আপনার ওই কথাটা, ওই যে– সৎ হওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে আনন্দের আর কিছু নেই, আমার বড্ড আনন্দ লাগে কথাটা শুনে। এ রকম একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে অনেক সময় অনেক অসৎ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আপনার এ কথাটা সেদিন শোনার পর এখন আর অসৎ হতে ইচ্ছে করে না।'

'থ্যাংকু স্যার। সবকিছুর জন্য, আমার আজকের এ অনুরোধটা রাখার জন্য।'

'জানিস?' বাবার মুখটা আনন্দে চিকচিক করছে, 'সেই ছেলেটা অফিসের এখন কী?'

'কী বাবা?'

'অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার।' বাবার চোখ দুটোয় আনন্দের ঝিলিক, 'এ রকম ভালো ছেলে আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। সুযোগ পেলেই পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ছেলেটা। ভাগ্যিস ছেলেটাকে চাকরি দিতে পেরেছিলাম, চাকরিজীবনে প্রথম একটা অনুরোধ করেছিলাম, বড়সাহেব আমার অনুরোধটা রেখেছিলেন।'

সম্ভবত বাবা আরেকটা অনুরোধ করেছিলেন তার অফিসে, তার রিটায়ার্ডের দিন। সেদিন সকালে বাবা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়েই আমাদের সবাইকে ডেকে তুললেন। তারপর বললেন, 'তোমরা সবাই আজ আমার সঙ্গে আমার অফিসে যাবে।'

মা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'টানা একত্রিশ বছর চাকরি করার পর আজ আমি অবসর নিচ্ছি। যদিও এ অবসরটা স্বেচ্ছায় নিচ্ছি। বড়সাহেব বলেছিলেন, আপনি যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আমি ইদানীং খেয়াল করছি, আগের মতো তেমন কাজ করতে পারি না। আমি যে পোস্টে কাজ করি, সেখানে আরো কর্মঠ একটা লোক দরকার। তাই...।' বাবার গলাটা ধরে আসে, 'আর কত করব, একত্রিশ বছর তো করলাম।'

সেদিন আমরা সবাই বাবার অফিসে গিয়েছিলাম। বাবার বিদায়ী অনুষ্ঠান। অফিসের সভাকক্ষের দেয়ালে একটা ছোট্ট কাগজের ব্যানার টানানো– আমাদের প্রাণপ্রিয় সহকর্মী সৎ, কর্মঠ, আদর্শবান জনাব বশির আহমেদের বিদায়ী অনুষ্ঠান। সভাকক্ষের টেবিলের ওপর একটা মস্ত বড় লাল-টকটকে ফুলের তোড়া রাখা আছে। আমরা বসে আছি টেবিলের পাশের চেয়ারে। অফিসের লোকজনও বসে আছেন আমাদের পাশে। জায়গা কম হওয়ায় অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পর অফিসের বড়সাহেব সভাকক্ষে ঢুকলেন। সময় কাটাতে এতক্ষণ বিভিন্ন ধরনের কথা হচ্ছিল, বড়সাহেব ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ হয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাবা এতক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে ছিলেন, বাবাও দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বড়সাহেব বসার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানটা শুরু হয়ে গেল। বাবার সহকর্মীদের দু-তিনজন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পর বড়সাহেব বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি তিন মিনিটের মতো কথা বললেন, এই পুরো তিন মিনিটই বাবার প্রশংসা করলেন

তিনি। শেষে বাবাকে কাছে ডেকে নিজ হাতে বাবার হাতে একটা কোরআন শরিফ, একটা জায়নামাজ আর একটা তসবিহ দিলেন। বাবা সেগুলো হাতে নিয়ে কিছুটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। বড়সাহেব বাবার পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, 'বশির সাহেব অফিসের নিয়ম অনুযায়ী তার পাওনাগুলো পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি আমার পক্ষ থেকে ওনাকে আজ বিদায় উপলক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করব।'

বাবার হাতে একটা চেক দিয়ে বড়সাহেব এবার বাবাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। বাবা হাতের জিনিসগুলো টেবিলের ওপর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু বাবাকে কেমন কুঁজোমানুষের মতো দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে খুক্ করে একটা কাশি দিয়ে বাবা বললেন, 'কী বলব আজ। অফিসের প্রথম দিন থেকেই সবার যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি, তার এক ভাগ ভালোবাসাও আমি কাউকে দিতে পারিনি। আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

বাবার গলা কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেমে থেমে বাবা আবার শুরু করলেন, 'আমার ছোট্ট একটা চাওয়া আছে আজ।'

সভাকক্ষের সবাই বাবার দিকে সরাসরি তাকালেন। বড়সাহেবও তার চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসলেন। বাবা খুব করে আবার একটু কাশলেন, 'পুরো একত্রিশ বছর আমি একটা চেয়ারে বসে কাজ করেছি। সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত অফিসে অনেক কিছু বদলে গেছে। এ চেয়ারটাও বদলে নতুন কোনো চেয়ার আসার কথা ছিল, কিন্তু আমি এ চেয়ারটা বদলাতে দিইনি। আজ আমি এ অফিস থেকে চলে যাচ্ছি। যদি অফিস আমাকে অনুমোদন করে তবে আমার এ একত্রিশ বছরের সঙ্গী এ চেয়ারটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।'

কথাটা বলতে বলতে বাবা কেঁদে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর দেখি মাও ফোঁত ফোঁত করে শব্দ করছে আর একটু পরপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। আমার চোখ দুটো শিরশির করছে, কেমন যেন করে উঠছে বুকের ভেতরটা!

বাবা অফিস থেকে চেয়ারটা পেয়েছিলেন। এ চেয়ারটা প্রথমে বাবার ঘরে ছিল, ভাইয়ারা বিল্ডিং করার পর বাবা একদিন তা ছাদে নিয়ে যান। প্রতিটি সন্ধ্যার আগে বাবা এ চেয়ারটাতে বসেন, পাশে আমি একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসি। তারপর গল্প আর গল্প।

ছাদে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ঘুম ঘুম চোখে ছোট ভাইয়া আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সেই যে দুপুরে এসে ঘুমিয়েছে, এইমাত্র ঘুম ভাঙল তার। অলস নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বাসায় এসব কী হচ্ছে, বল তো?'

'কই, কী হচ্ছে?' ভাইয়াকেই জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে। আবার শুনলাম অন্তুকেও পাওয়া যাচ্ছে না।' ভাইয়া বেশ বিরক্তি নিয়ে বলল, 'আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

'তোমার তো ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই।'

'এত ঝামেলার মধ্যে ভালো থাকা যায়?'

ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসার চেষ্টা করলাম। ছোটন যদি ভাইয়ার এ কথাটা শুনত, তাহলে ও বলত, 'কিন্তু ভালো ঘুম তো দেওয়া যায়।'

চোখ দুটো বড় বড় করে ভাইয়া তখন ছোটনের দিকে তাকাত, 'কী বললি?'

'আমি যা বলেছি, তুমি তা শুনেছ। অথবা এক কথা দুবার বলার দরকার কী। আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে কি ভাইয়া, ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।'

'মানে?'

'আমরা সবাই যখন ছোট, তখন বড় ভাইয়াকে একদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘটনাটা তোমার আমার কারোরই মনে নেই। মা প্রায়ই কথাটা বলত।' ছলছল করে উঠত তখন ছোটনের চোখ দুটো, 'দিন শেষে ভাইয়াকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল, জানো? এক আইসক্রিমওয়ালার পেছনে পেছনে ঘুরছিল ভাইয়া। কিছু বুঝলে?'

'এতে বোঝাবুঝির কী আছে?'

'আছে।' ভাইয়ার চোখের দিকে তাকাত তখন ছোটন, 'সেদিন বাবা অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন বড় ভাইয়ার জন্য, আজ বড় ভাইয়া অস্থির হয়ে গেছে তার ছেলের জন্য। একদিন তুমিও বাবা হবে, তোমার ছেলে বড় হবে, তুমি বুড়ো হবে। তারপর তুমি একদিন মন-খারাপ করে বাসা থেকে চুপচাপ বের হয়ে যাবে, তোমাকে না খুঁজে তোমার ছেলে তখন তোমার মতো আরাম করে ঘুমাবে।'

ছাদ থেকে হালকা বাতাসে ফুলের গন্ধ আসছে। গাছটা মাটিতে লাগানো ছিল। বিল্ডিং করার সময় বাবা তা তুলে বড় একটা টবে লাগিয়েছেন। প্রতি সন্ধ্যায় গল্প শেষে বাবা গাছটাতে পানি দিতেন। আজ এখনো পানি দেওয়া হয়নি। গাছটা কি বাবাকে খুঁজছে, অথবা তার ফুলের গন্ধ বিলিয়ে বাবাকে ডাকছে?

মুগ্ধ বিস্ময় ভরিয়ে দিয়ে দিনটা চলে যাচ্ছে, কিন্তু বাবা এখনো বাসায় ফিরলেন না।

গম্ভীর-মুখে ঘরে ঢুকলেন খালুজান। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। হাতের ব্যাগটা মেঝেতে রেখে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সোফায় বসলেন তিনি। তারপর পা দুটো সামনের দিকে মেলে দিয়ে হাত দুটো মাথার পেছনে নিয়ে ঠেস দিয়ে বসে বললেন, 'আজ কয়েকটা জিনিস শিখলাম।'

খালা খালুজানের পাশে বসে বললেন, 'কী শিখলে?'

'রাস্তার নেড়িকুকুর আর কোনো কোনো মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

'মানে!'

'এই শহরে এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের কোনো কাজ নেই। তাদের কাজই হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, কিংবা এক জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিছু দেখা অথবা ঝিম মেরে কোথাও বসে থাকা।'

'তাই না!'

মুখ দিয়ে ফোত করে একটা শব্দ করেন খালুজান, 'ব্যাপারটা তো তুমি জানো। সন্ধ্যার সময় প্রায় প্রতিটা টিভি বিক্রির শোরুমের দু-একটা টিভি চালিয়ে দেওয়া হয়। সে টিভি দেখার জন্য প্রতিটা শোরুমের সামনে প্রায় কয়েক শ লোক দাঁড়িয়ে থাকে, থাকে না?'

'তারা হয়তো সারা দিন কাজ করে, সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে বের হয়।'

'কিন্তু যারা দুপুর, বিকেল, এমনকি সন্ধ্যার সময়ও পার্কে ঘুরে বেড়ায়?'

'তারাও হয়তো কোনো না কোনো কাজ করে।'

'কচু করে।' চেহারাটা রাগী রাগী করে খালুজান বলেন, 'আমি ভেবে পাই না সারা দিন বসে থেকে তারা কী করে। আরেকটা কথা– সম্ভবত তারা স্কুলের ছেলেমেয়েই হবে, গায়ে স্কুল-ড্রেস পরা। আজ চন্দ্রিমা উদ্যানে গিয়ে দেখি, জোড়ায় জোড়ায় তারা বসে আছে একেকটা গাছের আড়ালে। আচ্ছা, ওদের লেখাপড়া নেই? ক্লাস নেই?'

'তুমি ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

'দুলাভাইকে খুঁজতে। ভাবলাম, বুড়োমানুষ, একা একা হয়তো কোনো পার্কে বসে আছেন।' কপালটা কুঁচকে ফেললেন খালুজান, 'আমার মাথায় ঢোকে

না, এ বয়সেই ওই ছেলেমেয়েগুলো জীবনটাকে কীভাবে উপভোগ করতে চাইছে।'

'তোমাকে এসব ভাবতে বলেছে কে?'

'বড় হলে এরা আসলে কী যে হবে! এদের মা-বাবাই বা কতটুকু খেয়াল রাখে এদের?'

'মা-বাবা কতটুকু খেয়াল রাখবে? বাবা হয়তো সারা দিন চাকরি বা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত, মা সংসার নিয়ে। তাদের উপায় আছে নাকি স্কুলে যাওয়ার নামে ছেলে-মেয়েরা কোথায় যায় তা খেয়াল রাখা?'

'আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে এদের জন্য।'

'ওদের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। অন্যের চিন্তা করতে করতে প্রায়ই তো নিজের প্রেসার বাড়িয়ে ফেল।' খালা আমার দিকে তাকালেন, 'কিরে, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস।'

বেতের সোফাটাতে বসতেই খালুজান বললেন, 'মা রে, তুই আমার পাশে এসে বোস তো।'

খালুজানের পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'সংসার হচ্ছে অনেক ঝামেলার একটা জিনিস, যখন তোর সংসার হবে তখন বুঝবি। শোন, তোকে একটা সত্য ঘটনা বলি এখন। দুলাভাইকে খোঁজার জন্য সংসদ ভবনের পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরছি। হঠাৎ দেখি আমার বয়সী একটা লোক ফুটপাতে বসে কাঁদছেন। খুব মায়া লাগল দৃশ্যটা দেখে। কাছে গিয়ে আমি লোকটাকে বললাম, ভাইজান, আপনার কী হয়েছে?'

চোখে পানি নিয়ে লোকটা বললেন, 'কিছু না।'

'কিছু না তো কাঁদছেন কেন?'

'সুখে কাঁদছি।'

'সুখে কেউ কাঁদে?'

'কাঁদে।'

'আপনি যদি আপনার ঘটনাটা একটু খুলে বলতেন।'

'ঘটনা আর কী। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছি, বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, তারা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সবাই বিদেশে থাকে, নিয়মিত আমার জন্য ডলার পাঠায়। এত সুখ আমার!'

'আপনার স্ত্রী?'

'সুযোগ বুঝে সেও চলে গেছে।' আকাশের দিকে হাত উঁচু করে বললেন, 'ওই যে, ওখানে চলে গেছে।'

'আপনার তো কোনো অভাব নেই, তবুও কাঁদছেন?'

অবাক হয়ে লোকটি আমার দিকে তাকালেন, 'আমার যে কিসের অভাব,

সেটা যদি আপনি জানতেন!'

'কিসের অভাব?'

চোখে পানি নিয়ে পাগলের মতো লোকটা হেসে উঠলেন, 'তা তো জানি না!'

খালুকে থামিয়ে দিয়ে খালা বললেন, 'আচ্ছা, তুমি থানায় গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। তেজগাঁও থানায় তো আগেই ইনফর্ম করেছ তোমরা।'

খালুজান খালার দিকে খুব কাতর চোখে তাকিয়ে বললেন, 'একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি আজ। একটা গরু হারিয়ে গেছে বলে মাইকিং হচ্ছিল। কল্যাণপুরের রাস্তায়। যে ছেলেটা মাইকিং করছিল, সে কাঁদছিল আর মাইকিং করছিল। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছে কেন ছেলেটা? তাকিয়ে দেখি রিকশাওয়ালা লোকটিও কাঁদছে। সেও কাঁদতে কাঁদতে বলল, গরুটা ছোটবেলা থেকে মানুষ করছিল তো।'

'হারাল কীভাবে?'

'তা জানি না।'

খালুজানের চোখ টলমল করছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'মাঝে মাঝে আমাদের অনেকেরই পশু হতে ইচ্ছে করে। আজ আমার খুব গরু হতে ইচ্ছে করছিল।'

'চুপ করো তো!' খালাও কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন।

'মানুষের মূল্য একেবারেই কমে গেছে, একেবারেই কমে গেছে।' মাথা ঝাঁকাতে থাকেন খালুজান।

খালা খালুজানের গায়ে হাত রেখে বলেন, 'তুমি আরো কয়েকটা হাসপাতালে খোঁজ নিতে চেয়েছিলে।'

'সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছি হাসপাতালগুলোতে। অনেক দিন পিজি হাসপাতালে যাই না। ওখানে কয়েকজন বন্ধু আছে আমার। আমি সি-ব্লকে ঢুকে এক ডাক্তারকে বললাম, বি-ব্লকটা কোথায়? উনি হাত দিয়ে ইশারা করে একটা বিল্ডিং দেখিয়ে দিলেন। সেই বিল্ডিংয়ে গিয়ে আরেক ডাক্তারের কাছে শুনি, এটা বি-ব্লক না। উনি আরেকটা বিল্ডিং দেখিয়ে দিলেন। তার কথা অনুযায়ী ওই বিল্ডিংয়ে গিয়ে দেখি, এটাও বি-ব্লক না, ওপাশের বিল্ডিংটা বি-ব্লক। কিছু বুঝলে? শেষে বি-ব্লক খুঁজে বের করে এক নার্সকে বললাম, ডা. মোহিত কোথায় বসে? নার্স বিজ্ঞের মতো বলল, স্যার তো সি-ব্লকে বসেন। সি-ব্লকে চলে এলাম আমি। এখানে এসে শুনি, মোহিত বি-ব্লকের ছয়তলায় বসে। সিঁড়ি ভেঙে বি-ব্লকের ছয়তলায় উঠে জানতে পারি, কয়েক দিন আগে মোহিতের চেম্বার চেঞ্জ হয়েছে, ও এখন এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের চারতলায় আছে। এক ডাক্তারকে খুঁজে বের করতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছে আজ। এবার বোঝো! কী যে হচ্ছে আজ

হাসপাতালগুলোতে!'

'শেষে পেয়েছিলে তাকে?'

'হ্যাঁ। তারপর ওকে নিয়েই তো সবগুলো ওয়ার্ড খুঁজে দেখলাম।'

'খালুজান, চা দেব?' আমি খালুজানের দিকে তাকালাম।

'না রে মা, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। একটু গোসল করা দরকার।'

'ও ভালো কথা, তোমাকে বলা হয়নি, বিকেল থেকে অন্তকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এটা কী বলছ তুমি!' বলেই খালুজান উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে খালা বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ।'

'একটা ছোট্ট ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর আমরা এখানে বসে আছি! যাই, এক্ষুনি খুঁজে দেখা দরকার।'

'এইমাত্রই তো বাইরে থেকে এলে।'

'কিছু হবে না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো খালুজান বাইরে চলে গেলেন। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। নারকেলগাছের আড়ালে সূর্যটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। গাছটার পাতাগুলোও কেমন যেন স্থির হয়ে আছে, যেন সারা দিন কাজ করার পর নিশ্চুপ বিশ্রাম নিচ্ছে তারা।

শিউলী হঠাৎ আমার পেছনে এসে বলল, 'আপা, আপনার ফোন।'

ফোনে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবু রিসিভার কানে চাপতেই ওপাশ থেকে বলল, 'আপু?'

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, কে?'

'বলো তো কে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছ না!' গলাটা অভিমানী হয়ে উঠল, 'ভুলে যাচ্ছ আপু আমাকে!'

'স্যরি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি শর্মী।'

'ও, শর্মী? স্যরি আপু।'

'আগামী মাসে আমরা দেশে আসছি আপু।'

'খুব ভালো।'

'কেন দেশে আসছি, জানো?'

'কেন?'

'বিয়ে করতে।'

'এত দিনে তাহলে বিয়েতে মত দিলে?'

'আমি তো মত দিইনি আপু।'

'তাহলে?'

'আমার কথা থাক। আপু শোনো, তোমার জন্য এবার একটা জিনিস নিয়ে আসব আমি।'

'কী।'

'সেটা আনলেই দেখতে পাবে।' শর্মী হাসতে থাকে, 'আচ্ছা আপু, তোমাকে যদি আমি এখানে আনতে চাই, তুমি আসবে?'

'আমি বিদেশে গিয়ে কী করব?'

'কিছু করতে হবে না। তুমি প্রতিদিন শুধু একবার করে ছোটনের গল্প করবে, ওর নতুন নতুন গল্প বলবে আমাকে।'

'ছোটনকে ভুলে যাও শর্মী।'

'ভুলে তো গেছিই। দেখ না বিয়ে করতে চাইছি!'

'তুমি কাঁদছ?'

কিছু বলল না শর্মী। ফোনটা নিঃশব্দে রেখে দিল।

শর্মী যখন আমাদের বাড়িতে প্রথম আসে, সেদিন মা খুব বিব্রত হয়ে গিয়েছিল। শর্মীকে দেখেই মা কপালটা কুঁচকে বলেছিল, 'মেয়েটা কে রে?'

আমি কিছু বলার আগেই ছোটন শর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মার ঘরে ঢুকে বলল, 'মা, এই মেয়েটাকে দেখো তো।'

মা কিছুটা আড়চোখে শর্মীর দিকে তাকাল।

'ভালো করে তাকাও।'

আঁচল ভালোভাবে টেনে নিয়ে মা শর্মীর দিকে ঘুরে বসল। তারপর ছোটনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলাম।'

'কেমন লাগল তোমার?'

'যদি বলি, না।'

ছোটন হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে তোমাকে আরেকবার দেখতে বলব।'

'তার পরও যদি বলি, না।'

'তাহলে আমার চোখ দুটো আমি তোমাকে দেব, তোমার চোখ দুটো আমি নেব।'

'সব চোখই সুন্দর চেনে, তার জন্য অন্যের চোখ ধার নিতে হয় না।' মা বিছানা থেকে উঠে এসে শর্মীকে একটা হাত ধরে বিছানায় বসাল। তারপর ছোটনকে বলল, 'তুই তোর ঘরে যা, আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবি না।'

ছোটন চলে যেতেই মা গম্ভীর-মুখে শর্মীকে বলল, 'মা, তোমাকে কিছু কথা বলি। দু-একটা প্রশ্নও তোমাকে করব, পারলে উত্তর দিয়ো।'

শর্মী মাথাটা নিচু করে বলল, 'জি।'

'তুমি ছোটন সমন্ধে কতটুকু জানো।'

বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে শর্মী বলল, 'সবটুকু।'

'সবটুকু!' কিছুটা আশ্চর্য হয়ে মা বলল, 'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'কীভাবে তুমি ওর সবটুকু জানো?'

'ওর সততা দিয়ে। যে মানুষ সৎ, তার আর কিছু জানতে হয় না।' আত্মবিশ্বাসে মুখটা লাল হয়ে গেছে শর্মীর।

'আমার তিনটা ছেলে, কেবল আমার এ ছোট ছেলেটাই ওর বাবার মতো হয়েছে। ওর বাবা মাঝে মাঝে আমাকে বলে, জানো, তোমার এ ছেলে সারা জীবন কষ্ট পাবে।' মার চোখ দুটো টলটল করে ওঠে।

মাথাটা উঁচু করে মার মুখের দিকে তাকায় শর্মী। তারপর আবার আগের মতো নিচু করে ফেলে, কিছু বলে না। মাও কিছু বলে না আর। রান্নাঘরের দিকে চলে যায় চুপচাপ।

বেশ কিছুক্ষণ পর শর্মী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপু, শুনেছি তুমি নাকি ছোটনের সবচেয়ে ভালো বন্ধু, তুমি কি আমার একটু পরীক্ষা নেবে?'

'কিসের পরীক্ষা?'

'দেখো তো, আমিও তোমার ভালো বন্ধু হতে পারি কি না।'

শর্মীর একটা হাত ধরে আমি বলি, 'ছোটনের যে বন্ধু, সে আমারও বন্ধু।'

'আপু, একটা মুশকিল হয়েছে কি জানো– ছোটনকে আমি যতটুকু না ভালোবাসি, তার চেয়ে বেশি বোধহয় ঈর্ষা করি।'

'কেন?'

'ক্লাসে এসে স্যার প্রথমেই ডাক দেন– ছোটন, ম্যাডাম এসে ডাক দেন– ছোটন। কোনো মেয়ের প্রবলেম হলো– ছোটন, কোনো ছেলের কোনো কিছু প্রয়োজন– ছোটন। মনে হয়, দেশে একটাই মাত্র মানুষ আছে, সে ছোটন।'

'তোমার ভালো লাগে না?'

'না।'

'সত্যি ভালো লাগে না?'

'কী বলব বলো।' শর্মী বেশ অভিমানী গলায় বলে, 'ও কি আমাকে তেমন সময় দেয়। শর্মী একটু থেমে বলে, এখন যাও দু-এক মিনিট সময় দেয়, আপু, দেখো, আগামীতে ও আমাকে একটুও সময় দেবে না।'

শর্মী এ কথাটাই আর একবার বলেছিল।

অ্যাকসিডেন্ট করার পর ছোটনকে তখন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অল্প অল্প জ্ঞান আছে ওর তখন। বুয়েটের অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভিড় করে রেখেছে হাসপাতাল। বেশ কিছুক্ষণ পর ও আমাকে অস্পট স্বরে বলল, 'আপু, একটু শর্মীকে ডেকে দে না।'

শর্মী কাছে আসতেই ছোটন ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করল। শর্মী ছোটনের হাত দুটো ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠল। ছোটন মুখটা হাসি হাসি করার চেষ্টা করে শর্মীকে বলল, 'কাঁদছ কেন, আমার তো কিছু হয়নি। তোমাকে বড় একটা কথা বলি, তুমি কি তুপাকে চেনো?'

'হ্যাঁ, ওই যে আমাদের সঙ্গে পড়ে, লম্বা করে মেয়েটা।'

'তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে ওর কখনো?'

'দু-একবার বোধহয় হয়েছে।'

'মেয়েটাকে একটু দেখে রাখবে তুমি?'

শর্মী হাতটা চেপে ধরে বলল, 'রাখব।'

'থ্যাংকু।' ছোটন ছলছল চোখে শর্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অভাবে পড়লে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, আমি অনেককে নষ্ট হতে দেখেছি। মেয়েটাকে তুমি নষ্ট হতে দিয়ো না।'

রাত ৮টার দিকে ছোটন মারা গেল। মা তিন দিন প্রায় অজ্ঞান হয়ে ছিল তারপর। বাবা কারো সঙ্গে কথা বলেননি কয়েক দিন। ছোটনের চল্লিশার দিন গরিবদের খাওয়ানো হচ্ছে। হঠাৎ শর্মী এসে আমার ঘরে ঢুকে বলল, 'আপু, তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম আমি, মনে আছে তোমার?'

'কোন কথাটা?'

'তোমাকে বলেছিলাম না, ছোটন আমাকে একটুও সময় দেবে না। দেখলে, ও ঠিকই আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।'

শর্মীর মাথায় একটা হাত রাখি আমি। গুমরে গুমরে ও কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে ও বলে, 'আপু, পরশুদিন বাবা-মার কাছে চলে যাচ্ছি, হয়তো কোনো দিন আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না আমার।'

সারা দিন থেকে বিকেলের দিকে চলে গেল শর্মী। চলে যাওয়ার সময় আমি শুধু ওর হাতটা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেকগুলো কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে। কিন্তু কিছুই বলা হয়নি। শুধু বুকের ভেতর হঠাৎ হঠাৎ ধুক ধুক করে উঠছিল– সম্ভবত সত্যি আর এ মেয়েটার সঙ্গে দেখা হবে না।

খালা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'এই দেখো, কে এসেছে!'

দৌড়ে গিয়ে দেখি, অন্তু দাঁড়িয়ে আছে ড্রইংরুমে। আমি দ্রুত ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'কোথায় গিয়েছিলি বাবা?'

'দাদুকে খুঁজতে।'

'খুব ভালো কথা।' আমি অন্তুর মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বললাম, 'তা কাউকে বলে যাবি না!'

'কাকে বলে যাব?'

'তোর বাবাকে, মাকে।'

'না, কাউকে বলতে ইচ্ছে করে না আমার।'

'আমাকে?'

অন্তু আমাকে জাপটে ধরে। বেশ কিছুক্ষণ পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, 'দাদুকে ছাড়া আমার একদম ভালো লাগে না ফুপু।'

'আমারও না রে।' পাগলের মতো বুকে জড়িয়ে ধরি আমি অন্তুকে। এ মুহূর্তে ওকে আমার পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজন মনে হচ্ছে।

বড় ভাইয়া আর ভাবিকে খবর পাঠান খালা মোবাইল ফোনে। কিছুক্ষণ পর তারা বাসায় ঢুকেই অন্তুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভাবি হ্যাঁচকা টানে অন্তুর একটা হাত ধরে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি হারামজাদা।'

'তোমাকে বলব না।'

'বলবি না মানে?'

'বললাম তো, তোমাকে বলব না।'

'আমাকে বলবি না তো কাকে বলবি!'

'কাউকেই বলব না।'

'কেন?'

'তোমাদের কারো সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।'

'কী বললি!' ভাবি অন্তুর গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মেরে বলে, 'তোর এত বড় সাহস!'

অন্তু হঠাৎ ওর মায়ের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'তুমি দেখো, আমি আবার পালাব। দাদুর মতো আমিও আর ফিরে আসব না কখনো।'

সারা দিন পর এই প্রথম সত্যিকারভাবে মনে হলো, বাবা আর ফিরে আসবেন না কখনো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে– মন খারাপ করা সন্ধ্যা। পশ্চিমের আকাশটা লাল, অন্তত বাবার ঘরের এই জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু লালই দেখা যাচ্ছে আকাশটাকে।

অসম্ভব শান্ত লাগছে সবকিছু, মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা থেমে আছে এখন। কোথাও সৃষ্টি নেই, ধ্বংসও নেই।

ছাদ থেকে নেমে এসে এই সময়টাতে বাবা একদম নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। চুপচাপ বসে থাকতেন নিজের ঘরে। সহজে কোনো কথা বলতেন না কারো সঙ্গে। সম্ভবত তার একটা কারণ আছে। তিন বছর আগে মা মারা গিয়েছিল, ঠিক এই সময়টাতেই, এই ঘরেই।

দৃশ্যটা আমার এখনো চোখে ভাসে। মার পেটে একটা ব্যথা ছিল, অনেক দিনের পুরনো। মাঝেমধ্যেই ব্যথা উঠত, আবার কমেও যেত। বহু ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, কিন্তু তারা কোনো কিছুই ধরতে পারেনি। সেদিনও প্রচণ্ড ব্যথা ছিল মার, সঙ্গে জ্বরও। কিছুক্ষণ পরপর মা ভীষণ চিৎকার করে উঠছে। মায়ের পেটে হাত বোলাচ্ছেন আর অস্থির হয়ে বাবা বলছেন, 'কেমন লাগছে এখন তোমার?'

'অসহ্য ব্যথা, অসহ্য ব্যথা।'

'একটু পানি খাবে, ঠাণ্ডা পানি?'

মাথাটা এদিক-ওদিক করে মা বলে, 'না।'

'পানি খেলে ভালো লাগতে পারে, ঠাণ্ডা পানি পেটের ব্যথার জন্য ভালো।' মায়ের মাথায় জলপট্টি দিচ্ছি আমি। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা তো মা, এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আয়।'

ডাইনিংরুম থেকে দ্রুত এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি এনেই দেখি মাকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কাঁদছেন বাবা। আমি বাবাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি, হাউমাউ করে কাঁদছেন বাবা। একটু পর মা ক্লান্ত গলায় বলল, 'আপনি কাঁদছেন কেন?'

বাবা কোনো কথা বলেন না, ডুকরে ডুকরে আরো কেঁদে ওঠেন তিনি। শুয়ে যেতেই বাবার মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে মা বলেন, 'যান, ওজু করে

আসেন, একটু পর আজান দেবে।'

ওজু করার জন্য ঘর থেকে বের হতে নিয়েই বাবা আমাকে বললেন, 'মা নূপুর, একটু শুনে যা তো।'

মায়ের পাশে পানির গেলাসটা রেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম আমি। বাবা আমার একটা হাত ধরে আমার ঘরে এসে বললেন, 'আমার মনে হয় তোর মাকে এখনই হাসপাতালে নেওয়া উচিত।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে বাবা।'

'কিন্তু একটা মুশকিলে পড়েছি যে মা।'

'কী?'

'তোকে যে কীভাবে বলি।' বাবা কেমন বিষণ্ন হয়ে বললেন কথাটা।

'বাবা–।' ভীষণ অভিমান হয় আমার, 'আমি কি বাইরের কেউ?'

'না না, আমি আসলে–।'

কথাটা শেষ করতে দিই না আমি, 'তাহলে?'

ভীষণ লাজুক হয়ে বাবা বলেন, 'চাকরি ছাড়ার পর অফিস থেকে যা টাকা-পয়সা পেয়েছিলাম, তার তো প্রায় সবই শেষ। আর বোধহয় দু-তিন হাজার টাকা আছে ব্যাংকে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার হাতে কোনো টাকা নেই।' মাথাটা নিচু করে ফেলেন বাবা, 'তোর কাছে কি কোনো টাকা হবে?'

ভেতরে ভেতরে ভীষণ চমকে যাই আমি, 'কত টাকা বাবা?'

'আপাতত হাজারখানেক হলেই চলবে।'

কিছুটা আমতা আমতা করে বলি, 'অত টাকা বোধহয় হবে না বাবা, পাঁচ শ টাকার মতো হতে পারে।'

'কিন্তু...।'

'বড় ভাইয়া আর ভাবি বোধহয় বাইরে গেছে, ছোট ভাইয়া আছে। বাবা, ছোট ভাইয়াকে বলি?'

বাবা খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরেন। তারপর খুব গম্ভীর স্বরে বলেন, 'না।'

খুব ভয়ে ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালাম আমি। রাগ আর লজ্জার মিশ্রণে কেমন যেন দেখাচ্ছে বাবার মুখটা। আমি বাবার আরো একটু কাছে ঘেঁষে বললাম, 'স্যরি বাবা।'

বাবা বললেন, 'আমিও স্যরি রে মা।'

'এখন কী হবে বাবা?'

'কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বাবা, একটা কথা বলব।' বাবার দিকে আবার ভয়ে ভয়ে তাকালাম আমি।

'বল মা।'

'আপনি রাগ করবেন না তো?'

'আমি কি তোর ওপর কখনো রেগেছি?'

'আমার কিছু সোনার জিনিস আছে।' বাবার চোখের দিকে তাকাই আমি, 'জিনিসগুলো বিক্রি করে ফেলি?'

অসহায়ের মতো বাবা আমার দিকে তাকান, 'কেন?'

'জিনিসগুলো তো আপনিই বানিয়ে দিয়েছিলেন বাবা।'

'ওগুলো আমি তোর বিয়ের জন্য বানিয়েছি মা।'

'পরে আবার বানানো যাবে, এখন আমাদের টাকা দরকার।'

'ওগুলো বিক্রি হয়ে গেলে পরে আর বানানো হবে না রে।'

'সেটা পরে দেখা যাবে।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাবা বলেন, 'নাহ্।'

বাবার একটা হাত চেপে ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আমি। তারপর বাবার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলি, 'একটা সত্য কথা বলবেন বাবা?'

'আমি তো কখনো মিথ্যা বলি না মা।'

বেশ ইতস্তত করে বাবাকে বলি, 'একজীবনে বিয়েটা কি খুব জরুরি? তা ছাড়া আমার কি কখনো...।'

কথাটা শেষ করতে পারি না আমি। মাথাটা নিচু করে ফেলছেন বাবা। আমি বাবার নিচু হওয়া মুখের দিকে তাকাই। বিড়বিড় করে কাঁপছে বাবার ঠোঁট দুটো। অনেক সত্য পাশ কাটানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় না, কিছু না বলেও সত্যটা বলা হয়ে যায়। বাবা কিছুই বললেন না। আমি মুখটা হাসি হাসি করে বললাম, 'পৃথিবীতে অনেক মানুষই বিয়ে করে না। আমি যতদূর জানি, তারা ভালোই থাকে।'

বাবা আর কোনো কথা বললেন না। ওজু করার জন্য বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমার ঘরে। মাগরিবের আজান পড়ছে।

মায়ের চিৎকার শোনা যাচ্ছে না আর এ-ঘর থেকে। যাক, ব্যথাটা তাহলে কমলো। দ্রুত বাবার ঘরে গিয়েই চমকে উঠলাম আমি। একদম স্থির হয়ে আছে মা। মায়ের বাঁ গালে একটা মশা বসে আছে, মুখটাও কেমন যেন হাঁ করা। আমি মুখের কাছে হাত নিলাম, হাতটা কাঁপছে আমার, কিন্তু কোনো নিঃশ্বাস নিচ্ছে না মা, ছাড়ছেও না। মা তার চোখ দুটোও খুলে রেখেছে। আলতো করে চোখ দুটো বন্ধ করে দিলাম আমি। কারণ ও-চোখ দিয়ে মা আর কোনো দিন দেখবে না।

ওজু করে বাবা ঘরে আসতেই আমি ডুকরে কেঁদে উঠে বললাম, 'বাবা-।'

হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে থামিয়ে দিলেন বাবা। মায়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে আলমারি থেকে জায়নামাজটা নিয়ে বিছিয়ে দিলেন মেঝেতে।

তারপর মাগরিবের নামাজ শুরু করলেন। নামাজ শেষে মার পাশে এসে বসলেন বাবা, তারপর মার ওপর মাথা রেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

মাত্র তিন বছর আগের কথা, অথচ মনে হয় কত দিন আগে ঘটেছিল ঘটনাটা।

বাবার ঘর থেকে ড্রইংরুমের দরজা খোলার শব্দ পেলাম, কে যেন এসেছে। বড় ভাবি জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চান?'

'নূপুর আছেন?'

'হ্যাঁ।' কেমন যেন রুক্ষ শোনাল ভাবির গলা।

'একটু ডেকে দেবেন?'

ভাবি আমাকে ডেকে দেওয়ার আগেই ড্রইংরুমে ঢুকলাম। সামনের দিকে তাকাতেই দেখি পল্লব। আমাকে দেখে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'চিনতে পেরেছেন?'

'না চেনার কোনো কারণ আছে কি?'

'আছে।'

'যেমন?'

'মানুষ প্রতিনিয়ত বদলায়, তাই প্রতিনিয়ত ভুলে যায়।'

'যারা বদলায় না?'

'সম্ভবত তারাও ভুলে যায়।' পল্লব হাসতে থাকে।

ভাবি এ-ঘর থেকে চলে গেছে। আমি পাশের সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে পল্লবকে বললাম, 'বসুন।'

'আজ আমি কেন এসেছি, জানেন?'

'কেন?'

'একটা কথা বলতে।'

'কথাটা কি খুবই জরুরি?'

'আপনার জন্য নয়, আমার জন্য।'

'বলুন।'

'তার আগে কি খুব কড়া করে আমাকে আজ এক কাপ চা খাওয়াবেন?'

'আপনি তো চা খান না।'

'আজ খাব।'

ভালো করে আমি পল্লবের দিকে তাকালাম। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে ওকে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবুও ঘামছে ও। সোফা থেকে উঠে চা আনার জন্য পা বাড়াতেই পল্লব বলল, 'শুনুন।'

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি।

'আচ্ছা, এই অসময়ে আপনার বাসায় এলাম আমি, আপনি মাইন্ড করেননি

তো?'

'মাইন্ড করলে চলে যাবেন?' হাসলাম আমি।

'না।'

'তাহলে বসুন।'

রান্নাঘরে ঢুকতেই বড় ভাবি বেশ রাগী গলায় বলল, 'ছেলেটা কে?'

ভাবির দিকে তাকালাম আমি। কপাল কুঁচকে আছে ভাবি। ভাবলেশহীনভাবে আমি বললাম, 'কোন ছেলেটা?'

'ওই যে, তোমার কাছে যে ছেলেটা এসেছে।'

'আমার বন্ধু।'

'তোমার বন্ধু!' ভাবি কপালটা আরো কুঁচকে ফেলল, 'তোমর বন্ধু নেশা করে?'

বেশ আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম, 'ও নেশা করেছে নাকি?'

'কেন, টের পাওনি তুমি?'

'কীভাবে টের পাব?'

'ওর মুখ থেকে গন্ধ পাওনি?'

'না।'

'তোমার নাকে এত গন্ধ আসে, আর এ গন্ধটা আসেনি!' ভাবি মুখটা বাঁকা করে কী যেন করতে থাকে আবার। আমি ভাবিকে পাশ কেটে চুলোয় পানি গরম দিই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবি বলল, 'পানি গরম করে কী করবে?'

'চা বানাব।'

'কে খাবে চা?'

'ও খাবে।'

'দেখো, চা খাওয়ার পর আবার বমি-টমি করে না বসে!'

'চা খেলে মানুষ বমি করে নাকি?'

'চা খেলে করে না। কিন্তু নেশা করার পর খেলে করে।' ভাবি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার অনেক আত্মীয় এসেছে আজ বাসায়, প্লিজ দেখো, কোনো কেলেঙ্কারি না করে বসে আবার!'

চা নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকেই পল্লবকে বললাম, 'একটা কথা বলব?'

'একটা কেন, অনেকগুলো বলুন।'

'আপনি কি নেশা করেছেন?'

পল্লবের চোখের মণি দুটো কেমন যেন স্থির হয়ে গেল। মাথাটা নিচু করে আবার তা তুলে আমার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে কি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে?'

'আমি অস্বাভাবিকতার কথা বলিনি, আমি নেশার কথা বলেছি।'

কিছুটা লাজুক চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা আবার নিচু করে ফেলল পল্লব। তারপর তার চেয়েও আরো লাজুক স্বরে ও ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন?' পল্লব হাসার চেষ্টা করে, 'তা তো জানি না।'

'ভালো মানুষ কখনো নেশা করে না।'

'আমি তো নিজেকে ভালো মানুষ মনে করি না।'

'তবে কি খারাপ মানুষ মনে করেন?'

'না, তাও মনে করি না।' বিষণ্ন শোনাল পল্লবের কণ্ঠ, 'খারাপ মানুষরা অনেক কিছু করতে পারে, আমি তাও পারি না। আচ্ছা, আপনাদের বাসায় এত মানুষ কেন?'

'আমার বড় ভাবির আত্মীয়-স্বজন এসেছেন।'

'কেন? কারো জন্মদিন কিংবা ম্যারেজ ডে নাকি? শব্দ করে গান বাজছে, সবাই কেমন আনন্দ করছে।'

'না। আসলে আমার বড় ভাইয়ার ছেলেটা বিকেলের দিকে কাউকে না বলে বাইরে চলে গিয়েছিল। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ওকে। সন্ধ্যার আগে আবার বাসায় ফিরে এসেছে ও। আনন্দে তাই সবাই দেখা করতে এসেছে।'

'আপনার তো মা নেই, আপনার বাবাও বুঝি খুব আনন্দ করছেন। হাজার হলেও দাদা, নাতি ফিরে এসেছে!' মাথা চুলকাতে চুলকাতে পল্লব বলল, 'আচ্ছা আমার চিঠি পেয়েছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, আজই পেলাম।'

'চিঠিটা পরশুদিন লিখেছিলাম।'

'এসব কী লিখেছেন আপনি চিঠিতে?'

'কী লিখেছি?'

'আপনি জানেন না, কী লিখেছেন?' চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বাবা অথবা মাকে কেউ খুন করতে চায় বা করে?'

'কিন্তু এখন বোধহয় সেটার প্রয়োজন হবে না।' কেমন যেন হাসতে থাকে পল্লব।

বুকের ভেতর ধক্ করে ওঠে আমার, 'মানে!'

'আমার মা মারা গেছে।'

'কবে?'

'আজই।'

'কখন?'

'সকালে।'

'কীভাবে?'

'কীভাবে আবার, আত্মহত্যা করেছে।'

এই প্রথম মনে হলো পল্লব নেশা করেছে। কেমন যেন জড়িয়ে আসছে তার কথাবার্তা, 'জানেন, মা মারা যাওয়ার পর থেকেই না বাবা নেশার মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বাবার দেখাদেখি আমারও কেমন যেন ইচ্ছে হলো। তাই...!' শব্দ করে হাসতে থাকে পল্লব।

'আপনি সত্যি বলছেন তো আপনার মা আত্মহত্যা করেছেন, না-।'

কথাটা শেষ করার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে যায় পল্লব। আমি অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কেমন যেন দুলে দুলে হাঁটছে ও। শব্দ করে হেসেই চলছে পল্লব। এ মুহূর্তে প্রচণ্ড হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে ওর হাসিটা।

'ফুপু, কী হয়েছে?'

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কোথায়?'

অন্তু ভয় ভয় গলায় বলল, 'ওই যে কে যেন চিৎকার করছিল।'

'কই, কেউ তো চিৎকার করছিল না!'

'কিন্তু আমি যে শুনলাম।'

অন্তুকে পাশে বসিয়ে বললাম, 'চিৎকার করছিল না রে বোকা, হাসছিল। আচ্ছা, বাইরে গিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরেছিস, বল তো?'

'অনেক জায়গায় ঘুরেছি।'

'অনেক জায়গা কোথায়?'

'সব জায়গা আমি চিনি নাকি?'

'সব জায়গা যখন চিনিস না তাহলে বাসা চিনলি কীভাবে?'

'বা রে, বাসা আমি চিনেছি নাকি, রিকশাওয়ালাকে এখানকার কথা বলেছি, রিকশাওয়ালাই নিয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, তোর ভয় করেনি?'

'কীসের ভয়?'

'যদি কোনো ছেলেধরা তোকে নিয়ে যেত!'

'আমি যেতাম নাকি তার সঙ্গে।'

'তোকে তো হাত-পা-মুখ বেঁধে নিয়ে যেত।'

'বললেই হলো, আমার গায়ে শক্তি আছে না!'

'বাব্বাহ্, তোর গায়ে অনেক শক্তি, না?'

অন্তু ওর ডান হাতের মাস্ল ফোলানোর চেষ্টা করল। তারপর হাতটা আমাকে দেখিয়ে বলল, 'কী, শক্তি আছে না?'

আমি ওর অল্প ফুলে ওঠা মাস্লে হাত রেখে বলি, 'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে তোর অনেক শক্তি।'

অন্তু আমার হাত ধরে বলল, 'ফুপু, চলো না।'

'কোথায়?'

'আমাদের ঘরে।'

'কেন?'

'বড় খালা কেক নিয়ে এসেছেন, খাবে, চলো।'

'পরে খাব বাবা।'

অন্তু চলে যাচ্ছে। আমি ওকে ডাক দিলাম, 'অন্তু, শোন।'

ঘুরে দাঁড়াল অন্তু। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তুই কি আবার কখনো পালিয়ে যাবি?'

অবাক চোখে অন্তু আমার দিকে তাকায়। আমি ওর মাথাটা আমার বুকে জড়িয়ে বলি, 'আবার যদি কখনো পালিয়ে যাস, আমাকে সঙ্গে নিস, আমিও তোর সঙ্গে পালাব রে!'

শব্দ করে খালা ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'শোন, তেজগাঁও থানা থেকে ফোন করেছিল।'

ভীষণ উদগ্রীব আমি বললাম, 'কী বলেছে?'

'একটা বৃদ্ধমানুষকে নাকি খুঁজে পাওয়া গেছে।' খালা বেশ হতাশ সুরে বলেন, 'কিন্তু লোকটার মাথায় নাকি চুল নেই। দুলাইভায়ের মাথায় তো চুল আছে।' খালা একটু থেমে বলেন, 'তবু যাবি নাকি একবার, চল, দেখে আসি।'

ড্রেসটা চেঞ্জ করে আমরা যখন বাইরে যাব, ঠিক তখনই খালুজান এসে উপস্থিত। খালাকে দেখে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'তেজগাঁও থানা থেকে ফোন করেছিল।'

'অন্তু বাসায় ফেরার পর তুমি যখন ফোন করেছিলে, তখন ভাবলাম, এখনই বাসায় ফিরে কী হবে, আরো একটু ঘুরে দেখি। ঘুরতে ঘুরতে আবার তেজগাঁও থানায় গেলাম, ভাবলাম নতুন কোনো খবর পাওয়া যায় কি না। তখন তারা একটা বৃদ্ধলোককে দেখাল।'

'অ।' আবারও হতাশ শোনায় খালার গলা।

কলবেলটা বেজে উঠল আবার। খালুজান ঘুরে দাঁড়াতেই আমি গিয়ে দ্রুত খুলে দিলাম দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে বেশ চমকে উঠলাম আমি– তুপা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আমাকে দেখেই প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপু, আংকেলকে পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'ওই যে–।'

পুরোটা শোনার মতো ধৈর্য নেই আমার। তুপার হাত ধরে আমি বললাম, 'চলো।'

ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমি সামনের দিকে। অনেক আলো জ্বলছে চারদিকে, কিন্তু সবকিছু শূন্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। কেবল চোখের জল আর আলোর মাঝামাঝি কেমন যেন তারার মতো জ্বলে উঠছে চোখের সামনে। বহুদিন আগে একটা গোল্ডফিশ কিনে এনে দিয়েছিলেন বাবা আমাকে। হরলিকসের কাচের বয়ামের ভেতর পানি দিয়ে মাছটা তার মধ্যে রেখেছিলাম আমি। মাছটা লেজ নাড়িয়ে সাঁতার কাটত, মুগ্ধ হয়ে তা দেখতাম আমরা। একদিন দেখি মাছটা মেঝেতে পড়ে প্রাণপণ লাফাচ্ছে। আমি দ্রুত তুলে পানিতে দেওয়ার আগেই মরে গেল মাছটা। সেদিন সারা দিন কেঁদেছিলাম আমি। বিকেলে বাবা অফিস থেকে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনেক দিন পর ইচ্ছে করছে– বাবা যদি সেদিনের মতো আমাকে আজ জড়িয়ে ধরতেন!

আমি তাকিয়েই আছি। মানুষের চোখ অনেক কিছুই দেখেছে। প্রাচীন স্থাপত্য এক মুহূর্তে ভেঙে যেতে দেখেছে, সুনামিতে জলের তাণ্ডব দেখেছে, ভূমিকম্পে অনেক ধ্বংসলীলা দেখেছে, দেখেছে জীবিত কারোর মৃত হয়ে প্রস্থান কিংবা এক মুহূর্ত আগের নিজের অস্তিত্বের আমূল পরিবর্তনও কেউ কেউ। মানুষ মঙ্গল গ্রহের পাথর দেখেছে, চাঁদের পাদদেশ দেখেছে, সাগরের গভীর নীল জল দেখেছে, সেখানে ফুটে থাকা বর্ণিল পরিবেশ দেখেছে। সভ্যতার এই চরম সময়ে অসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপও দেখেছে। মানুষ অনেক কিছু দেখেছে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর একটা মানুষও এ দৃশ্যটা কখনো দেখেনি। আমি সে দৃশ্যটা এখন দেখছি।

সারি সারি বনসাইগুলোতে লেখা আছে– বিক্রি হবে। বনসাই মেলার সে বনসাইগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বাবাও। বাবার গলায় কাগজের একটা ছোট্ট সাইনবোর্ড ঝুলছে– বিক্রি হবে।

ব্যাপারটা আমরা কেউই টের পাইনি, অথচ খুব নীরবে ঘটে গেছে ঘটনাটা। সেদিনের পর থেকে বাবা একদম চুপ ছিলেন পাঁচ-ছয় দিন। কোনো কথা বলতেন না তিনি, অন্তুর সঙ্গে খেলতেন না, খাবার দিতেন না চড়ুইদের, পানি দিতেন না টবের গাছে, এমনকি ছাদেও যেতেন না। ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের পর সেই জায়নামাজেই বসে থাকতেন, ঘুমানোর আগ পর্যন্ত প্রায় সেখানেই কাটাতেন তিনি। ডাইনিং টেবিলে মাঝে মাঝে খেতে যেতেন, তবে বেশির ভাগ সময় ঘরেই খাবার দেওয়া হতো তাকে। বাবা বদলে গেছেন, সম্পূর্ণ বদলে গেছেন বাবা।

বেশ সকালে একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমার। প্রথমে কিছু বুঝতে পারি না আমি। স্থির হয়ে একটু কান পেতেই শুনি বাবা হাসছেন, প্রচণ্ড শব্দ করে হাসছেন আর কথা বলছেন।

কৌতূহল নিয়ে বাবার ঘরে গিয়ে দেখি, বাবা জানালা দিয়ে নারকেলগাছে কিচির-মিচির করা চড়ুই দেখছেন আর হাসছেন। নিঃশব্দে বাবার পিঠে হাত রাখলাম আমি। বাবা আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'মা নূপুর, একটা মজার জিনিস দেখছি রে, খুবই মজার জিনিস!'

বাবা আবার হাসতে থাকেন। আমি আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলি, 'বাবা, এ দৃশ্য তো আপনি প্রতিদিনই দেখেন।'

'সকালে উঠে এ-ঘরের এই জানালাটা খুলে দিলেই তো নারকেলগাছটা দেখা যায়, গাছে চেঁচামেচি করা চড়ুই দেখা যায়, বাতাসে ঝিরঝির করা নারকেল-পাতার শব্দ শোনা যায়।'

'তাই নাকি!'

বাবার মুখের দিকে পূর্ণ চোখে তাকাই আমি, 'বাবা, কাল চড়ুইদের খাবার দেওয়ার সময় ওই ছড়াটা বললেন না– বাবুই পাখিরে ডেকে বলিছে চড়াই, কুঁড়েঘরে থেকে করো শিল্পের বড়াই... ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটা ব্যাপার কী, জানিস– চড়ুইও কিন্তু প্রায় কুঁড়েঘরেই থাকে। চড়ুইদের বাসাও তো খড়কুটো দিয়ে বানানো।' বাবা আমার হাত ধরে একটু এগিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে বলেন। আমি

বাইরে তাকালাম।

'কিছু দেখতে পাচ্ছিস মা?'

'হ্যাঁ বাবা, অনেকগুলো চড়ুই।'

'আরো একটু ভালো করে তাকাত মা।'

আমি আরো ভালো করে তাকালাম।

'এবার কিছু দেখতে পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ বাবা, চড়ুই তো দেখতে পাচ্ছি।'

'একটু খেয়াল করে দেখ, কয়েকটা চড়ুই কোথা থেকে যেন মুখে করে খাবার এনে ছোট ছোট কয়েকটা চড়ুইকে খাওয়াচ্ছে।'

'হ্যাঁ, চড়ুইগুলো ওদের বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে।'

বাবা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ান। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কিছুটা নিচু স্বরে বলেন, 'একটা কথা বলবি?'

'কী কথা বাবা?'

'আচ্ছা, ছোট ছোট ওই চড়ুইগুলো যখন বড় হয়, তখন কি ওরা ওদের বাবা-মার কথা মনে রাখে?'

এবার বাবার মুখের দিকে ভালো করে তাকাই আমি। মাথাটা নিচু করে ফেলেছেন বাবা। অনেকক্ষণ এভাবে মাথাটা নিচু করে রেখে বাবা হঠাৎ আবার হেসে ওঠেন। বাবা হাসছেন, কিন্তু বাবার চোখে পানি!

বাবা বেশ প্রশ্ন করতেন ইদানীং। যাকে পেতেন তাকেই করতেন। সেদিনের পর মরিস বেশ কয়েকবার আমাদের বাসায় এসেছেন, পুলিশ সার্জেন্টও এসেছেন, পল্লবও এসেছে। সবাইকে কোনো না কোনো প্রশ্ন করতেন বাবা।

পল্লবকে বাবা একদিন বললেন, 'তোমার বাবা বেঁচে আছেন?'

খুব তাচ্ছিল্যভরা স্বরে পল্লব বলল, 'জানি না।'

'জানো না মানে!'

'আমি তো আমার বাবার সঙ্গে থাকি না এখন।'

'কেন?'

একটু ভেবে পল্লব বলল, 'অসৎ মানুষের সঙ্গে বাস করতে আমার ঘৃণা হয়।'

'তোমার বাবা অসৎ মানুষ!' বাবা কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'একজন বাবা সৎ না অসৎ, সেটা সম্ভবত তার সন্তানরাই আগে জানে।'

'সন্তানরা বাবা-মার আর কিছু জানে না?'

'জানে।'

বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'না, তারা জানে না।' বাবা একটু থেমে বলেন,

'তোমার মা কেমন আছেন?'

'মা মারা গেছে।'

'কবে?'

'এই তো কয়েক দিন আগে।'

'তার জন্য তোমার কষ্ট হয় না?'

'না।'

'কেন?'

'মাকেও আমি খুব ঘৃণা করতাম।'

'মাকে ঘৃণা করতে!' বাবা আবারও অবাক হয়ে যান, 'কী বলছ তুমি এসব!'

পল্লব ম্লান হেসে বলে, 'আমার মা কেবল একজন স্ত্রী হতে পেরেছিল কিন্তু মানুষ হতে পারেনি কখনো।'

'তোমার কাছে মানুষের সংজ্ঞা কী?'

'অন্যায় দেখে যে প্রতিবাদ করে, মানুষ কেবল সে-ই।'

'যারা প্রতিবাদ করতে পারে না?'

'তাদের মরে যাওয়া উচিত।'

পল্লব চলে যাওয়ার পর বাবা বেশ কয়েক দিন পল্লবের কথাটা ভেবেছেন। প্রায় বিড়বিড় করে কী যেন বলতেন মাথা নিচু করে। সেদিন বাসায় তুপা আসায় বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'মা, কখনো কোনো কিছু নিয়ে প্রতিবাদ করেছ?'

বাবার কথাটা শুনে তুপা চুপচাপ কী যেন ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর খুব শান্তভাবে বলে, 'আমরা মেয়েরা তো প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করি আংকেল।'

'করো?'

'করি, তবে নীরবে।'

বাবাও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, 'শুধু নীরবে না, তোমাদের প্রতিবাদটাও অন্যরকম।'

তুপা একটু হেসে বলে, 'হয়তো।' তুপার হাসিটা ম্লান হয়ে যায়, 'হয়তো তাই আমরা কাউকে কিছু না-বলে চুপচাপ চলে যাই সবকিছু ছেড়ে।'

'এবং খুব সহজেই যাও।' বাবার চোখটা টলটল করে ওঠে। ঘরের দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বাবা একসময় কেঁদেই ফেলেন।

বাবা মাঝে মাঝে একদম চুপ হয়ে যেতেন, মাঝে মাঝে আবার কথা বলতেন অনর্গল। বেশির ভাগই বাবার শৈশবের কথা আর মায়ের কথা। মায়ের কথা যখনই শুরু করতেন বাবা, তখনই শব্দ করে কেঁদে উঠতেন তিনি।

কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বাবা ইদানীং যার সঙ্গে কথা বলতেন, সে হলো অন্তু। স্কুল থেকে এসেই অন্তু যখন বাবার ঘরে আসত, বাবা তখন বেশ চঞ্চল হয়েও উঠতেন। শুয়ে থাকলে উঠে বসতেন, কোনো কাজ করলে আপাতত সে কাজটা

আর করতেন না। মোট কথা যে কাজেই ব্যস্ত থাকতেন না কেন, সব ফেলে অন্তুর দিকে তাকাতেন, অন্তুকে কাছে টেনে নিতেন।

বাবা একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেছিলেন, 'দাদু, বল তো, বড় হয়ে তুই কোন কাজটা সব সময় করতে চাইবি?'

'বড় হয়ে আমি তোমার মতো বাসা থেকে পালাব দাদু।'

বেশ চমকে উঠে বাবা বলেন, 'কেন?'

'বা রে, তুমি পালাও যে!'

বাবা অন্তুকে কোলে বসিয়ে বলেন, 'বাসা-পালানো ভালো না দাদু। বাসা থেকে পালায় দুষ্টুরা।'

'তুমি কি তাহলে দুষ্টু?'

হাসতে হাসতে বাবা বলেন, 'হ্যাঁ দুষ্টু।'

'আমিও তাহলে দুষ্টু হব।'

ইদানীং অন্তু আরেকটা কাজ করত। ও ওদের ঘরে ঘুমাতে চাইত না। বাবার সঙ্গে ঘুমাতে চাইত। ভাইয়া কিংবা ভাবি হয়তো জোর করে বাবার ঘর থেকে ওকে নিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ও ঠিকই আবার চলে আসত বাবার ঘরে।

খালা প্রায় প্রতিদিনই বাবাকে দেখতে আসতেন আমাদের বাসায়। কোনো কোনো দিন আমাদের বাসায় থেকেও যেতেন। বাবার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে উদাসও হয়ে যেতেন খালা। খুব গোপন একটা কথা শুনেছিলাম সেদিন। মায়ের প্রসঙ্গ আসতেই বাবা খুব নরম গলায় খালাকে বললেন, 'আমাদের বিয়ের কথা তোমার মনে আছে শাহানা?'

হাসতে হাসতে খালা বললেন, 'কেন মনে থাকবে না।'

'সেদিন তোমরা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে, না?'

'সেটা কি অবাক হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ছিল না?'

'না।' কয়েক মুহূর্ত খালার দিকে তাকিয়ে থেকে বাবা বললেন, 'খুব সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল ওটা।'

'আপনি অসাধারণ ছিলেন, তাই ব্যাপারটা আপনার কাছে সাধারণ ছিল।'

'তোমার কাছে তা-ই মনে হয়?'

'শুধু আমার কাছে না, অনেকেই তা-ই মনে করত।'

'অথচ ব্যাপারটা আসলেই সাধারণ।' বাবা বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'কী যেন একটা কাজে তোমাদের এলাকায় গিয়েছিলাম আমি। হঠাৎ কার কাছে যেন শুনি, তোমার বোনের বিয়ের সব বরযাত্রী নাকি মারা গিয়েছিল লঞ্চ ডুবে। তার পর থেকে তোমার বোনকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। বিয়ের দিন বর মারা যাওয়া নাকি খুবই অলক্ষুনে। কথাটা শুনে প্রচণ্ড জেদ চেপে গিয়েছিল আমার।'

'আর জেদের বশবর্তী হয়েই আপাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন আপনি।'

'আসলে কথাটা শুনে এত খারাপ লেগেছিল। একটা মেয়ে, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু কোনো এক কাকতালীয় মৃত্যুর জন্য তার বিয়ে হবে না, এটা আমি ভাবতেই পারিনি।'

'বাবা তো প্রথমে রাজি ছিল না আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতে।'

'সেটা আমার দৈন্যতার জন্য ছিল না, বাবা আমার হৃদয়ের শক্তি পরীক্ষা করছিলেন।'

'আপাও তো আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিল, যাতে আপনি তাকে বিয়ে না করেন।'

'তোমার বোনের আগে আমি কোনো মেয়ের নিজ হাতে লেখা চিঠি কখনো পাইনি। তোমার বোনের চিঠি পেয়ে আমি সারা দিন এক আচ্ছন্নের মধ্যে ছিলাম। তার পর থেকেই জেদটা আরো বেড়ে যায় আমার।'

খালা চোখ দুটো ছলছল করে বলে, 'দুলাভাই, একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'আপনারা কি সুখী ছিলেন?'

'খুব।' মাথাটা নিচু করে কী যেন একটা ভেবে বাবা বলেন, 'যতটুকু সুখী হলে আরো বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে ঠিক ততটুকু।'

বাবার সঙ্গে সবচেয়ে কম কথা হতো ইদানীং আমার। মা মারা যাওয়ার পর যে বাবার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কথা হতো আমার, সেই বাবাই আমার সঙ্গে তেমন কথা বলতেন না ইদানীং। তবে বাবা সব সময় তার কাছাকাছি রাখতে চাইতেন আমাকে।

মাঝরাতে একদিন ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি, কে যেন আমার পায়ের কাছে বসে আছে। ভীষণ চমকে উঠে বিছানায় বসার আগেই বাবা ফিস ফিস করে বললেন, 'মা রে, দুটো জিনিস জানার জন্য তোর এখানে এসেছি।'

বাবা কেমন যেন কাঁপছেন। আমি ঝট করে উঠে বসে বাবার একটা হাত ধরে বললাম, 'বলুন।'

'জিনিসটা তেমন কিছু না। কালকে জানলেই হতো। তবু কেন যেন আজকে জানার ভীষণ ইচ্ছে হলো।'

আমি বাবাকে আবার বললাম, 'বলুন।'

বেশ ইতস্তত করে বাবা বললেন, 'বল তো, একটা বনসাই আর একজন বৃদ্ধমানুষের মধ্যে মিলটা কোথায়?'

'মূলত কোনো মিল নেই। একটি গাছ, আরেকটি মানুষ।'

বাবা ম্লান হেসে বলেন, 'আছে। একটা জিনিসকে চেষ্টার মাধ্যমে ছোট করে রাখা হয়, আর একটা জিনিস সংসারে থাকতে থাকতে এমনি ছোট হয়ে যায়। দুটো জিনিসই বয়সী, মানে বৃদ্ধ, বুড়ো।' বাবা একটু থেমে বলেন, 'এবার বল

তো, এ দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

ফ্যালফ্যাল করে আমি বাবার মুখের দিকে তাকাই। খুব উৎসাহী হয়ে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন পরীক্ষার হলে অজানা কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছেন কোনো সহপাঠীর কাছ থেকে।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা।'

আগের মতোই বাবা ম্লান হেসে বলেন, 'বুঝতে পারছিস না?'

'না বাবা।'

আমার দিকে গভীর চোখে তাকান বাবা। তারপর বেশ বিষণ্ন, ক্লান্তভাবে হাসেন, 'সংসারে নতুন এসেই একটা জিনিস অপরিসীম যত্ন পায়, আর সারা জীবন সংসারের পেছনে নিজের জীবন ব্যয় করেও অন্য জিনিসটি রয়ে যায় অবহেলিত, হয়ে যায় অপাঙ্ক্তেয়।' বাবার গলার স্বরটা কেমন ভেজা ভেজা লাগে, 'আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে রে মা।'

বাবা আর কোনো কথা বলেন না। মাথা উঁচু করে আমি বাবার চোখের দিকে তাকাই। চোখ দুটো সম্পূর্ণ ভিজে গেছে বাবার। বাবার একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'না, আর কোনো পার্থক্য খুঁজতে হবে না আপনাকে। চলুন, আপনার ঘরে রেখে আসি আপনাকে। এখনো অনেক রাত, ঘুম দরকার আপনার।'

তবুও আমার বিছানায় বসে থাকেন বাবা। আমি বাবার হাতটা টেনে বলি, 'চলুন বাবা, ঘুমাবেন।'

বেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ান। একটু এগিয়ে দরজার কাছে গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ান তিনি। তারপর আমার মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, 'বৃদ্ধ এবং ছোট করে রাখা একটা গাছের মূল্য অনেক, কিন্তু বৃদ্ধ এবং ক্রমাগত ছোট হয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কোনো মূল্য নেই।'

খুব ধীর পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান বাবা। কোনো কথা নেই আর, কোনো শব্দও নেই, শুধু গভীর এক বেদনা বয়ে যায়, বুকের মাঝখান দিয়ে, একসময় ছড়িয়ে যায় তা সারা শরীরে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন প্রথমেই আমি বাবার ঘরে যাই। ফজরের নামাজ শেষে এক গেলাস পানি খান বাবা। আজও গিয়েছিলাম আমি। বাবা সেই যে রাতে যেভাবে শুয়ে ছিলেন, এখনো সেভাবেই শুয়ে আছেন।

খুব কাছে গিয়ে বাবার দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। তারপর পানির গেলাস রেখে দিলাম পাশের টেবিলে। কারণ এ পানিটা আর প্রয়োজন নেই বাবার। বাবা মারা গেছেন, খুব নীরবে চলে গেছেন তিনি আমাদের ছেড়ে।

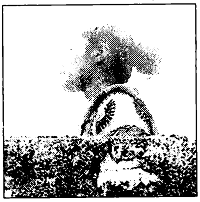

প্রতিদিনের মতো এখনো খুব সকালে ঘুম ভাঙে আমার। তারপর প্রতিদিনের মতো এখনো বাবার ঘরে যাই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবার বিছানায় বসি, কখনো শুয়ে পড়ি। হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়লেই সেই স্বপ্নটা দেখি। বাবা আমার পায়ের কাছে বসে আছেন, আর আমার অসম্পূর্ণ পা'টা ধরে কাঁদছেন। আমি চমকে উঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করি, 'বাবা, কাঁদছেন কেন?' বাবা চোখে জল নিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'আনন্দে রে মা, আনন্দে।'

'কিসের আনন্দ বাবা?'

'সে এক গোপন আনন্দ।'

'খুবই গোপন?'

'হ্যাঁ, খুবই গোপন।'

'বলা যাবে না আমাকে?'

'মা রে।' বাবা মুখটা লাজুক করে বলেন, 'তোর কাছে এসে আমি আসলে কী দেখি, বল তো?'

'কী দেখেন বাবা?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বাবা বলেন, 'কাছে এসে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তোর মাকে দেখি।'

এর পরপরই ঘুমটা ভেঙে যায় আমার। স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বাবার ঘরের জানালাটা খুলে দিই আমি। নারকেলগাছটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকি, সেখানে চড়ুইপাখিরা কিচিরমিচির করে ইচ্ছেমতো, কখনো দু-একটা পাখি এসে জানালায় বসে উঁকি দিয়ে যায়। মনে হয়, কাকে যেন খোঁজে ওরা।

বাবার সেগুন কাঠের লাঠিটা নিয়ে মাঝে মাঝে হাঁটি আমি। বাবার হাঁটার সময় যে রকম শব্দ হতো, আমার হাঁটার সময়ও শব্দ হয়, অবিকল বাবার হাঁটার শব্দের মতো।

মরিস মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসেন। প্রতিবার তার একই কথা,

'খোকি, টোমাকে একটা বিয়ে ডেব আমি।'

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'কেন?'

'টাহলে টোমার বাচ্চা হবে, আমি আর জনা সে বাচ্চার সঙ্গে খেলব।'

খালা আমাকে প্রায়ই বলেন, 'চল তো, কয়েক দিন আমার বাসায় থাকবি।'

আমি বলি, 'না।'

খালার বাসায় গেলে আমার ভালোই লাগবে, তবুও 'না' বলি। কেন বলি, জানি না। আমার প্রায়ই মনে হয়, বাবা হয়তো একদিন হঠাৎ এসে বলবেন, 'আমার তো বাসা থেকে পালানোর অভ্যাস ছিল, কয়েক দিন তোদের ছেড়ে তাই পালিয়ে ছিলাম। কিন্তু ভালো লাগল না রে, তাই ফিরে এলাম।'

প্রাইমারি স্কুল পার করার পর বাবা আমাকে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে বাইরে নিয়ে যেতেন। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ, এমনকি ফাগুনের প্রথম দিন, ভালোবাসার দিনও বেড়াতে যেতেন বাবা আমাকে নিয়ে। বাবা সারাক্ষণ আমার হাত ধরে হাঁটতেন আর একটু পরপর জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেমন লাগছে মা?'

আমি বলতাম, 'ভালো।'

সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'হাঁটতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

জন্মের পর থেকেই তো হাঁটতে আমার একটু অসুবিধা হয়। আমি তবু বলি, 'একদম না।'

বাবা আরো খুশি হয়ে বলেন, 'জীবনটা হচ্ছে উপভোগের, যথাসম্ভব তা উপভোগ করা উচিত। তুই কী বলিস মা?'

মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আমি বলতাম, 'ঠিক বাবা, ঠিক।'

সারা দিন যেভাবেই কাটুক, বিকেল হলেই আমি ছাদে চলে যাই। বাবার চেয়ারটা এখনো ছাদেই আছে। আরেকটা চেয়ার নিয়ে ওই চেয়ারের সামনে বসে আমি বাবাকে কল্পনা করি। বাবা আমার সঙ্গে গল্প করেন, হরেক রকমের গল্প।

কখনো কখনো মনে হয়, সত্যি সত্যি বাবা এসে গল্প করছেন আমার সঙ্গে। ঘোর কাটতেই মনে হয়, না, এটাও একটা কল্পনা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ছাদ থেকে নামার জন্য পা বাড়াতেই কে যেন বলল, 'মা নূপুর, কেমন আছিস?'

চমকে উঠে আমি পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাতেই বাবা বলেন, 'কিরে, ওভাবে তাকিয়ে আছিস

কেন? বললি না, কেমন আছিস?'

'আমি কেমন আছি?' বাবাকেই প্রশ্নটা করি আমি। কিন্তু বাবা সে প্রশ্নের উত্তর দেন না। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারা ছাত্রের মতো মাথা নিচু করে হেঁটে যান তিনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, বাবা হেঁটে যাচ্ছেন, ছাদ পার হয়ে বাতাসে হাঁটছেন, ভেসে ভেসে হাঁটছেন। আমাকে আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন করে একসময় হাঁটতে হাঁটতে মিলে যান বাবা আকাশে।

আমার সমস্ত পৃথিবীটা দুলে ওঠে। মনে হয়, কেউ ছিল না আমার, কোনো দিন, কখনো ছিল না। বুকের মাঝখানে নিঃশব্দে আর্তনাদে সবকিছু কেমন যেন মনে হয়– স্থির, বিবর্ণ, মৃত। অথচ ছাদে এসে আজ একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম বাবাকে, 'বাবা, আজ বসন্ত!'

❑